বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
বাংলাদেশ
সুশীল সমাজের গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা

২০০৭-০৮

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০সি, সড়ক ১১, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন (৮৮০২) ৯১৪৫০ ৯০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৮১২৪৭৭০
ফ্যাক্স (৮৮০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল cpd@bdonline.com
ওয়েবসাইট www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা
ফাল্গুন ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসৌষ্ঠব
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
সাইফুল হাসান

ISBN 984 300 001713 2

মূল্য
২৫০.০০ টাকা

মুদ্রক
এনরিচ প্রিন্টার্স
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

Bangladesher Arthoneeti Parjalochana 2007-08. State of the Bangladesh Economy in FY 2007-08. Published by the Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka-1209, Bangladesh. Price : Tk 250.00
ISBN 984 300 001713 2

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮

গবেষকবৃন্দ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. *মোস্তাফিজুর রহমান* ও সদ্য বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক ড. *দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের* নেতৃত্বে বর্তমান গ্রন্থের রিপোর্টগুলো প্রস্তুত হয়। এ রিপোর্টসমূহ প্রণীত হয়েছে সিপিডির বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা প্রোগ্রামের অধীনে যা আইআরবিডি নামে পরিচিত।

সিপিডির যে সকল সহকর্মীবৃন্দ আইআরবিডি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন– *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগ; ড. *উত্তম দেব*, প্রধান, গবেষণা বিভাগ; ড. *ফাহমিদা খাতুন*, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো; ড. *খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম*, রিসার্চ ফেলো; *কাজী মাহমুদুর রহমান*, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; *ওয়াসেল বিন সাদাত*, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; *আশিক ইকবাল*, গবেষণা সহযোগী এবং *তৌফিকুল ইসলাম খান*, গবেষণা সহযোগী।

গবেষণাকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে সিপিডির যে সকল গবেষকবৃন্দ সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন– *আসিফ আনোয়ার*, গবেষণা সহযোগী; *তাজিন তাহ্‌সিনা*, গবেষণা সহযোগী, *নাফিসা খালেদ*, গবেষণা সহযোগী; *সুবীর কান্তি বৈরাগী*, গবেষণা সহযোগী; *খালেদা আক্তার*, গবেষণা সহযোগী; *হাসানুজ্জামান*, গবেষণা সহযোগী; *সৈয়দ মোতাহার সামনান*, গবেষণা সহযোগী; *সুপর্ণা দাশগুপ্তা*, গবেষণা সহযোগী। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিন্যাসের দায়িত্বে ছিলেন- *দেবযানী সেন গুপ্তা*, প্রোগ্রাম সহযোগী, *তারিকুর রহমান*, প্রোগ্রাম সহযোগী; *ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী*, প্রোগ্রাম সহযোগী এবং *তাপস কুমার পাল*, প্রোগ্রাম সহযোগী।

এ গ্রন্থের 'বন্যা-উত্তর বাংলাদেশের কৃষি: মাঠ পর্যায়ের অবস্থা ও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ' এবং 'ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: কৃষকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টো প্রণয়ন করেছেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. *মাহবুব হোসেন* এবং সিপিডির ড. *উত্তম দেব*।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একটি জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশি-ষ্টবিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে, যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, সরকারি আমলা, উন্নয়ন অংশীদার, বিশেষজ্ঞ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোকে নিয়ে নিয়মিত নীতি সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আইআরবিডি) অন্যতম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলমান গবেষণা কর্মের মধ্যে আছে– বাণিজ্যনীতি বিশেষণ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডবিউটিও)-এর প্রভাব পরিবীক্ষণ, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা, জনসংখ্যা ও টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার, সুশাসন ও উন্নয়ন, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা। এসব গবেষণা সিপিডির সংলাপ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা *(IRBD)*

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (IRBD) প্রকল্পটি সিপিডির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আইআরবিডি কর্মসূচির আওতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি পর্যায়ে তার ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে, সিপিডি তা সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। সরকারি বার্ষিক মূল্যায়ন ও দাতা সংস্থার বাৎসরিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি সুশীল সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীন মূল্যায়ন হিসেবে আইআরবিডি ইতিমধ্যে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন, বাজেটের বিশেষণ, প্রধান প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আইআরবিডি প্রকল্পের অধীনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কালপর্বে বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের কৌশল নির্ধারণের জন্যও গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সুশাসন, বিশ্বায়ন, শ্রমবাজার, দারিদ্র্য, আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ওপর আইআরবিডি প্রকল্পের অধীনে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিও আইআরবিডি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে প্রণীত।

সূচি

মুখবন্ধ		নয়
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		এগারো
১	২০০৭০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি: প্রথম ছয় মাসের অগ্রগতি ও আগামী ছয় মাসের চ্যালেঞ্জ	১
২	২০০৭০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের বিশেষণ	২৭
৩	২০০৭০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট: সিপিডির সুপারিশমালা	৫৫
৪	বন্যাউত্তর বাংলাদেশের কৃষি: মাঠ পর্যায়ের অবস্থা ও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ	৬৭
৫	ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: কৃষকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ	৭৩
	সংযুক্তি ১ বাজেট সংলাপ ২০০৭	৭৯
	সংযুক্তি ২ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জি: জানুয়ারিডি সেম্বর ২০০৭	১১১

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতি বছরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পর্যালোচনা প্রণয়ন করে আসছে। এ পর্যালোচনাগুলো যাতে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী হয় সে ব্যাপারে সিপিডি সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছে। এসব গবেষণার ক্ষেত্রে সিপিডি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যউপা ত্ত ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সিপিডির পরিচালিত নিজস্ব জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৪০৮ শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকসমূহের গতিপ্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে সাতটি আশাব্যঞ্জক দিক ও আটটি উদ্বেগজনক দিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ছয় মাসের জন্য সাতটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি পরামর্শও এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশের অর্থনীতির আশাব্যাঞ্জক দিকগুলোর মধ্যে ছিল– প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় সাফল্য, রাজস্ব আয় বিশেষত আয়করের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের (রিজার্ভ) তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান, প্রবাসীদের প্রেরিত আয়ের (রেমিটেন্সের) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রবাহ, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি এবং মূলধন বাজারে গতিশীলতা; এবং উদ্বেগজনক দিকগুলোর মধ্যে ছিল– মূল্যস্ফীতির উচ্চহার, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতির কারণে জনগণের প্রকৃত আয় হ্রাস, শিল্প খাতে স্বল্প প্রবৃদ্ধির হার, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শথ গতি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধীর গতি, রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির নৈরাশ্যজনক হার এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির অভাব।

চলমান অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকারকে বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিতে হবে, সেগুলো হলো-প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন, পুনর্বাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রহণ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু সার বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত কৃষি পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভর্তুকি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ২০০৭০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বাজেটের উলেখযোগ্য প্রস্তাবনাসমূহকে গুরুত্বের সাথে নিরীক্ষণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সরকারি অর্থায়ন কাঠামো (রাজস্ব আয়, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়ন), আর্থিক পদক্ষেপসমূহ (কর এবং শুল্ক সম্পর্কিত কার্যক্রম, কর প্রশাসনে পুনর্বিন্যাস এবং শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার পদক্ষেপ) খাত ও অঞ্চলভিত্তিক উদ্যোগ (কৃষি, শিল্প, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক, তাঁত, পাট, নিউজ প্রিন্ট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), রপ্তানি উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ, পরিবেশ, পরিবহণ, যোগাযোগ, জ্বালানি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ, বিদেশি বিনিয়োগ, পুঁজি বাজার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন),

সামাজিক খাত এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাত, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি)। এর সাথে সাথে বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সিপিডির প্রস্তাবিত সুপারিশমালা। উলেখ্য যে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষম আয় বন্টনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিপিডি ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তুতিপর্বে অর্থনীতির সাতটি খাতে ২৪টি বিষয়ে সর্বমোট ১১৩টি সুপারিশ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য পেশ করেছিল। এ প্রস্তাবাবলীর মধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রণোদনা, রপ্তানি সহায়তা, স্থানীয় শিল্প বিকাশ, কর প্রশাসন সংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোক্তামূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপারিশ রয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পর পর দু'বার বন্যা এবং তারপরেই ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিডরের প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আলোচিত হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। বন্যায় কৃষকের ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ, চলমান কৃষি কার্যক্রমের অবস্থা এবং কৃষি পুনর্বাসনে কৃষকের প্রয়োজন নিরূপণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি জেলায় (টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়ার ধুনট, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট) কৃষকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির সুপারিশ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এ সকল সুপারিশের মধ্যে রয়েছে– শস্য পুনর্বাসন কর্মসূচি, সার বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রয়োজনমাফিক বীজ সরবরাহ, কৃষি ঋণের সরবরাহ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় সিডরের শিকার হয়েছেন বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলের বারোটি জেলার ২০ লাখ পরিবারের ৮৭ লাখ মানুষ, বিনষ্ট হয়েছে ১৫ লাখ ঘরবাড়ি ও ৪১ লাখ গাছপালা এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে ১০ লাখ একর জমির শস্য। ফলশ্রুতিতে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতে পারে বলে ব্যাপকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চরম ক্ষতিগ্রস্ত চারটি জেলার (পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর এবং বাগেরহাট) কৃষকদের সাথে শস্যের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আবশ্যকীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রধানের চেষ্টা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এ প্রবন্ধে কৃষি কাঠামো, ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান, এবং কৃষি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনার আলোকে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু পরামর্শ তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি গুচ্ছ (প্যাকেজ) কর্মসূচির প্রস্তাবনা– যেটিতে বীজ, জমি চাষের যন্ত্রপাতি, সেচ পাম্প, সার এবং কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য কৃষি ঋণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বর্তমান গ্রন্থের দু'টো সংযুক্তির প্রথমটি হচ্ছে বাজেট সংলাপ ২০০৭। সিপিডি গত ১৪ জুন ২০০৭ তারিখে ঢাকায় *'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা ২০০৬২০০৭ এবং বা জেট বিশ্লেষণ ২০০৭ ২০০৮'* শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে। গত ৭ জুন ২০০৭, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ২০০৭০৮ অর্থ বছরের যে প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন, সেই বাজেটের ওপর মন্তব্য, বিশেষণ, পর্যালোচনা ও মতামত বিনিময় করার জন্য তাঁর উপস্থিতিতে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম সংযুক্তিতে সংলাপে আলোচিত বিষয়সমূহ ও মতামত সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংযুক্তির বিষয়বস্তু, জানুয়ারিডি সেম্বর ২০০৭ সময়ে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জী। এ সময়কালীন প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে এ সংযুক্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের দেশে অর্থনীতি চর্চার একটা বড় অংশই হয়ে থাকে ইংরেজিতে। অথচ সহজবোধ্যভাবে বাংলা ভাষায় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর অভিঘাত ফেলে। তাই সংশিষ্ট ইস্যুগুলোর ব্যাপারে জানার অধিকার তাঁদের রয়েছে। তাঁদের কাছে বোধগম্যভাবে এ বিষয়গুলোকে নিয়ে যাওয়ার একটা দায়িত্ব আমাদের রয়েছে বলে সিপিডি মনে করে। বর্তমান গ্রন্থটি সে দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন।

আশা করা যায়, বর্তমান গ্রন্থটি সরকারকে তার গৃহীত কর্মসূচির মূল্যায়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক অবস্থা, বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির অভিঘাত, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন নাগরিকদের কৌতুহল ও আগ্রহ পূরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সিপিডির গবেষণা বিভাগের প্রধান *উত্তম দেবকে* আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক *ড. মাহবুব হোসেন* এ গ্রন্থের দুটো অধ্যায়ের লেখক হিসেবে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুবাদসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছেন- সিপিডির সহকর্মীবৃন্দ *ফাহমিদা খাতুন, খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, কাজী মাহমুদুর রহমান, অভ্র ভট্টাচার্য, নাফিসা খালেদ, সুবীর কান্তি বৈরাগী, খালেদা আক্তার* ও *আশরাফুজ্জামান, এবং সাংবাদিক জাকির হোসেন* ও *উৎপল সরকার*। বর্তমান সংকলনটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সিপিডির ডায়ালগ ও কমিউনিকেশন ডিভিশনের পরিচালক *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*। তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসৌষ্ঠব করেছেন *অভ্র ভট্টাচার্য*। কপি এডিটিং ও প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন *নাজমাতুন নূর*। *হামিদুল হক মন্ডল* এবং *আব্দুল কুদ্দুস* অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাসের দায়িত্বে ছিলেন *সাইফুল হাসান*। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এনরিচ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং-এর কর্মীবৃন্দকে, যাঁরা গ্রন্থটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

১

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি

প্রথম ছয় মাসের অগ্রগতি ও আগামী ছয় মাসের চ্যালেঞ্জ

১. সূচনা

বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রায় সব লক্ষ্যই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। পরপর দু'টো বন্যা, ঘূর্ণিঝড় সিডর, বৈশ্বিক বাজার পরিস্থিতি, দেশীয় মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিস্থিতি সমগ্র অর্থনীতির জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জিত হবার সম্ভবনাও শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ, রেমিটেন্সের প্রবাহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ, পুঁজি বাজারের চাঙ্গাভাব ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ই আমাদের আশাবাদী করে। যদিও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি, রপ্তানি, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রতিনিয়তই বিপদসংকেত বাজিয়ে চলছে।

বর্তমান নিবন্ধে তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে–

(ক) বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর অবস্থা

(খ) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহের সম্ভাব্য চিত্র এবং

(গ) ২০০৮ সালে নির্ধারিত সময় নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তার ওপর।

২. ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা

২.১ সরকারি অর্থ সংস্থান

২.১.১ রাজস্ব আয়

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম কয়েক মাসে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য এসেছে। কর প্রদানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপ্রদর্শিত অর্থকে করের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়কালে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৪ শতাংশ, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তুল্য সময়ে যা ছিল মাত্র ৯.৭ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত ২১.২ শতাংশ অধিক হারে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাই একটি সঠিক পদক্ষেপ হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়াও আয়কর সংগ্রহ বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে আয়কর ৩৪ শতাংশ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে যা অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। সর্বজনীন স্ব-নির্ধারণ কর পদ্ধতি আয়কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ১৬.৮ শতাংশ হারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর মাসে

আমদানি শুল্ক বেড়েছে ১০.৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের তুল্য সময়ে অনেক কম ছিল (৩.৮ শতাংশ)। যদিও ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রকৃত সংগ্রহের তুলনায় ২৩.৪ শতাংশ হারে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আগামী সাত মাসে রপ্তানি শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিক জোর দিতে হবে। রপ্তানি সংক্রান্ত শুল্ক আদায়ের (রপ্তানি শুল্ক, রপ্তানি ভ্যাট এবং রপ্তানি অংশের অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর) ক্ষেত্রেও ১৮.৮ শতাংশ হারে লক্ষ্যণীয় মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ধারণা করা যায়, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির চেয়ে অধিক রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক নিরাপত্তার উন্নতির কারণেই তা ঘটেছে। এ সময়কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৬.১ শতাংশ অর্জন করেছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তুল্য সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৩১.৫ শতাংশ।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে মাত্র প্রথম দুই মাসের তথ্য পাওয়া গেছে। এ সময়কালে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত আয়ের সংগ্রহ বেড়েছে ৩৫.৭ শতাংশ। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর উপাদান (১৯.৯ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত উপদানের (৩৭.৯ শতাংশ) আকর্ষণীয় কৃতিত্ব।

অতিমাত্রায় রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সম্পূরক রাজস্ব সংগ্রহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গত পাঁচ মাসের অর্জন অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু আগামী মাসগুলিতে এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সহজ কাজ হবে না। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বর্তমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সুফল ভোগ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অবশ্যই কর প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

২.১.২ রাজস্ব ব্যয়

২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে– যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ১৫.৬ শতাংশ বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসের তথ্য-উপাত্ত বিশেষণ করলে রাজস্ব ব্যয়ের উচ্চহার লক্ষ্য করা যায় (৩০.৭ শতাংশ)। বিশেষ করে ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়ের (debt servicing) কারণে রাজস্ব ব্যয় বর্তমান লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়। সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে ১৪.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এখন পর্যন্ত ৩৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট সময়কালের রাজস্ব ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫,২৯৪.৪ কোটি টাকা (মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০.৮ শতাংশ) যা গত অর্থবছরের তুল্য সময়ে ছিল ৪,০৫০.৪ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৯.৫ শতাংশ)।

ধারাবাহিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বিভিন্নভাবে সরকারের ব্যয় সামনের মাসগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের রাজস্ব ব্যয় বাজেটে ২,১৮২.২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ৫.২ কোটি টাকা জুলাই-আগস্ট সময়কালে ব্যয় হয়েছে। এই থোক বরাদ্দ বন্যা ও সিডর বিধ্বস্ত এলাকার পুনর্বাসন কাজে অর্থায়নের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।

২.১.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)

২০০৭-০৮ অর্থবছরে জুলাই-অক্টোবর মাসের তথ্যানুযায়ী এডিপি ব্যয় ছিল ৩,০৪২ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার ১১ শতাংশ। এই ব্যয় বর্তমান বছরগুলোর ক্রমাবনতির চিত্র বহন করে। প্রকৃতপক্ষে এই নিম্নহার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের কারণে ঘটেছে বলে সহজেই ধারণা করা যায়। গত অর্থবছরে তুল্য সময়ে এডিপির আওতায় মোট বরাদ্দের ১৪.৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল। যে ১৪টি মন্ত্রণালয় নিজেদের বাজেট নিজেরা তৈরি করে থাকে তারাও এক্ষেত্রে

উলেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়নি। প্রথম চার মাসে স্থানীয় মুদ্রার ২৫ শতাংশ ছাড় করা হয় যা গত বছরের তুলনায় কম (২৯ শতাংশ)। তবে এই পার্থক্য মূলত তৎকালীন সরকারের নির্বাচনপূর্ব বেপরোয়া অর্থ অবমুক্তকরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল।

ধারাবাহিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ব্যয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এ কারণে এডিপি বরাদ্দের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হবে। দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে এই অর্থ পর্যাপ্তভাবে পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় হয়। এই কাটছাঁট করার সময় কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এডিপি-র প্রকল্পগুলোকে পুনর্বিবেচনায় এনে যেসব প্রকল্পে এখনো অনুমোদিত হয়নি বা তেমন অর্থ অবমুক্ত হয়নি সেসব প্রকল্পগুলোকে বাতিল বা রদ করতে হবে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে এডিপিতে মোট ২,৩১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮৯৮ কোটি টাকা অননুমোদিত প্রকল্পে ও ১,৪১৪ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই অননুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে ৬৪৬ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে এবং বাকি অংশ প্রকল্প সাহায্য থেকে আসবে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজে অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও অব্যবহৃত থোক বরাদ্দ সরকারের কাছে একটি ভালো উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২.১.৪ বাজেট ঘাটতি

ব্যাপক আকারে ঘাটতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে একটি উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাজেটের এই উচ্চমাত্রার ঘাটতি জিডিপির ৫.৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত দায় বাদ দিলেও বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপির ৪.২ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে মোট (বিপিসির দায় ব্যতিত) ঘাটতির পরিমাণ উলেখযোগ্য হারে (২৮.৫ শতাংশ) বাড়তে পারে। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষে রাজস্ব আয়-ব্যয়ে মোট ঘাটতি ছিল ৯,৮৫০.০১ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৫.৫ শতাংশ বেশি। এই ঘাটতি অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোট ঘাটতির ৮৩.৩ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারি ঋণের পরিমাণ উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (জুলাই-অক্টোবর মাসে ৩৩.৩ শতাংশ হারে)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের শুরুর মাসগুলোতে মূলত ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার ঋণ নিয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের মধ্যে ব্যাংকিং খাত এবং অ-ব্যাংকিং খাতের সরবরাহ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৮.৯ এবং ১১.১ শতাংশ । অন্যদিকে বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এসময়ে নিট বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ১৬৪২.৭৪ কোটি টাকা, গত বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৬৩.৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৈদেশিক সহায়তা ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধির অনেকটাই হয়েছে মূলত বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচির কারণে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচির অর্থায়নের জন্য আগামী মাসগুলোতে ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাবে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ক্ষয়ক্ষতি, জ্বালানী তেল ও খাদ্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সংকুলানের জন্য সরকারকে রাজস্ব আয় আরও বাড়াতে হবে। একই সাথে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় কমাতে হবে। যেহেতু রাজস্ব ব্যয় কাটছাঁট করার প্রয়োজন পড়বে, সেহেতু অনুমোদিত কিন্তু অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের ব্যয় রদ করতে হবে এবং অনুমোদিত কিন্তু অছাড়কৃত প্রকল্পের তহবিল বাতিল করতে হবে। বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ কাজে থোক বরাদ্দ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নেওয়া যেতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

২.২ আর্থিক খাত

২.২.১ অর্থ সরবরাহ, অর্থের মজুদ ও তারল্য

২০০৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে অর্থ সরবরাহের (M3 অনুসারে) প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.২৩ শতাংশ, এবং অর্থের মজুদের ক্ষেত্রে ৫.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। তফশিলিভুক্ত ব্যাংকগুলোতে তারল্যের আধিক্য মোটামুটি একই জায়গায় অবস্থান করছিল। অন্যদিকে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্যাংকগুলোর তারল্য ছিল ১৪,২৭৪.৫৫ কোটি টাকা এবং উক্ত বছরে জুন মাসে তা ছিল ১৪২৭৯.৪২ কোটি টাকা।

২.২.২ অভ্যন্তরীন ঋণ

পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে বিশেষণ করলে দেখা যায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে অক্টোবর মাসের শেষভাগে ১২.৯২ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীন ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে।

২.২.২.১ সরকারি ঋণ গ্রহন

২০০৭-০৮ অর্থবছরে অক্টোবর মাসের শেষদিকে সরকারি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ৬.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যদিও অপরাপর সরকারি ক্ষেত্রগুলোতে এর নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। সার্বিকভাবে সরকারি ক্ষেত্রে ঋণের মধ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৮৭.৮৫ শতাংশ যা ১২.৬৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে জাতীয় সঞ্চয়পত্র সার্টিফিকেট থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৩২ শতাংশ, যেখানে ব্যাংকিং খাত হতে সরকারি ঋণের পরিমাণ ১৭.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। সিডর পরবর্তী পুনর্বাসন কাজে সরকারের যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে তার ফলে ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২.২.২.২ বেসরকারি ঋণ গ্রহন

২০০৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষদিকে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে) বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৮৪ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের মধ্যে ৯২.৩১ শতাংশ এসেছে ব্যাংক সেক্টর থেকে এবং বাকি অংশ এসেছে ব্যাংক বহির্ভূত ডিপোজিটরি কর্পোরেশন (NBDCs) থেকে।

২.২.৩ শিল্প ঋণ

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে প্রদেয় ঋণের ভেতরে শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি (৪২.৭০ শতাংশ) লক্ষ করা গেছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ৫৭.৭৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে একক বৃহৎ অংশীদারে পরিণত হয়েছে। মোট ঋণের মধ্যে যার অংশ ৬১.০৩ শতাংশ। উলেখিত সময়ে মেয়াদি ঋণ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ৫০.৭৯ শতাংশ হারে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে মূলধনের ক্ষেত্রে ১২.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ১০.৬৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধিও বিবেচনায় আনতে হবে। এর বিপরীতে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে মূলধন ৭৭.৪৯ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে।

২.২.৪ খেলাপী ঋণ পরিস্থিতি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাসিফাইড ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৪১ শতাংশ। অন্যদিকে গত অর্থবছরের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোট ক্লাসিফাইড ঋণের একটি

বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। খেলাপী ঋণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক সংস্থার (DFIs) একটি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র লক্ষ করা গেছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১.৩২, ২০.০ ও ৩.৬১ শতাংশ।

২.২.৫ কৃষি ঋণ

জুলাই-নভেম্বর সময়কালে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ ছিল ১৮৬৯.৩ কোটি টাকা, যা গত ২০০৬-০৭ অর্থবছরের এই সময়ের তুলনায় ৬.৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে সিডর এবং বন্যার ক্ষতির কারণে গত অর্থবছরের তুলনায় ঋণ পরিশোধের মাত্রা ১৬.৫ শতাংশ কম হয়েছে। সার্বিকভাবে গত অর্থবছরের ঋণাত্মক গতি কাটিয়ে এবারে কৃষি খাতে ঋণের প্রবাহ ধনাত্মক গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। শস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ঋণের চাহিদা বেশি থাকলেও কৃষি ঋণের দুর্বল প্রবৃদ্ধি আমাদের জন্য সংকট তৈরি করতে পারে। সরকারকে অবশ্যই ঋণের জন্য অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে বন্যা ও সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। এই পদক্ষেপ আসন্ন বোরো মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং ২০০৮ সালের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রেও এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

২.২.৬ মূল্যস্ফীতি

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ করে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে) সাধারণ, খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ১০.০৬, ১১.৭৩ এবং ৭.৪২ শতাংশ। গত ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের তুলনায় ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৬.৯৮ শতাংশ থেকে ৮.২৫ শতাংশে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণেই সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের এই মূল্যস্ফীতি ৭.৬৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে ৯.২৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা বর্তমান অবস্থার জন্য অধিকাংশে দায়ী। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানির মধ্যকার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ধারণা করছে যে, ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে খাদ্যের সরবরাহ বেশি থাকবে। অবশ্য তা আমাদের খুব একটা আশাবাদী করে তোলে না। কারণ ২০০৬ এর তুলনায় এই সরবরাহ এখনো কম। গত চার মাসের মূল্যপরিস্থিতির আলোকে আমরা বলতে পারি, যদি দাম কমানো না যায় তাহলে ৬.৫ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এই চিত্র কখনোই আশাপ্রদ নয়।

এটি মনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও জীবনযাত্রার মূল্য বৃদ্ধির মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অঞ্চলের নীতিনির্ধারকদের বর্তমানে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হল সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ধরে রাখা। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারত ও চীনের মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ৫.৫১ ও ৪.৪০ শতাংশ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে পাকিস্তানে অধিক মূল্যস্ফীতি দেখা গেছে, যার পরিমাণ ৭.৬ শতাংশ। বাংলাদেশের তুলনায় এসব দেশ তাদের মূল্যস্ফীতি পরিমিত মাত্রায় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যদিও অধিক মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব দেশে দাম বৃদ্ধির প্রভাবকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারছে। অন্যদিকে, ১৫.৪ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি নিয়ে শ্রীলঙ্কা এ অঞ্চলের স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার শ্রীলঙ্কা বর্তমানে একটি ব্যাপক অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

এটি উলেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ডিসেম্বর মাসে সরকার বহু প্রতিক্ষিত ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৭ প্রনয়ণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যা সম্পূর্ণভাবে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করবে। এ আইন প্রবর্তিত হলে বিক্রেতা কর্তৃক নিয়মিত ভোগ্যপণ্যের আযৌক্তিক দাম চাওয়া, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, খাদ্য পরিবহনে বাধা সৃষ্টি, সেবা প্রদানের নামে জালিয়াতি, ঔষধ এবং অন্যান্য পণ্যে ভেজাল মেশানো ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভোক্তারা আইনের সাহায্য চাইতে পারবেন। এই আইন ভোক্তাদের অন্যান্য বিভিন্ন অধিকারও নিশ্চিত করবে, যেমন–পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, মেয়াদকাল ইত্যাদি। কিছুদিন আগে সিপিডি পণ্যের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, প্রস্তুতকাল এবং মেয়াদকাল প্রদর্শন করার সুপারিশ করেছিল। সিপিডি কর্তৃক প্রণীত মূল্য সংক্রান্ত গবেষণার সুপারিশ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের কম বা বেশি দামে ক্রয় বা বিক্রয় না করার জন্য বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারনার প্রয়োজন। এসব সংস্কারের সফলতা নির্ভর করছে কোন বিষয়গুলোর ওপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধিক গুরুত্ব দেবেন তার ওপর।

২.২.৭ সুদের হার

অক্টোবর ২০০৭ অনুযায়ী প্রকৃত বাণিজ্যিক সুদের হার ছিল ২.৫১ শতাংশ, যা ২০০৭ অর্থবছরের শেষভাগের তুলনায় ৩.৫ শতাংশ কম। সর্বোপরি গচ্ছিত অর্থ তার প্রকৃত মূল্যকে সংরক্ষিত করতে পারছে না এবং প্রকৃত অর্থে তা ঋণত্মাক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। গচ্ছিত অর্থের প্রকৃত হারে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না, বরং জুন ২০০৭-এ (-) ২.১৬ শতাংশ অক্টোবর ২০০৭-এ (-) ২.৮৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে অধিক মূল্যস্ফীতির আলোকে নিকট ভবিষ্যতে গচ্ছিত অর্থের প্রকৃত হার নিরূপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই পরিস্থিতি আমানতকারীদেরকে নিরুৎসাহিত করছে এবং তা মধ্যমেয়াদে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে শেয়ার বাজারে স্থায়ী সুদহীন শেয়ারের আকস্মিক চাহিদা এই পতনেরই প্রতিফলন। ঋণ ও আমানতের এই বিস্তর ফারাক হ্রাস পাবার সম্ভাবনা কম, যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশে ব্যাংক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২.২.৮ মুদ্রা বিনিময় হার পরিস্থিতি

গত বছরের তুলনায় নভেম্বর ২০০৭ সালে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১.৮৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ইউরো এবং ভারতীয় রুপির তুলনায় টাকার মানপতন অব্যাহত রয়েছে যার পরিমাণ যথাক্রমে ১১.৯৫ ও ১২.১৮ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য আমদানি মূল্য কমানো (টাকার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে) ও মুদ্রা বিনিময় হারকে মুদ্রা নীতির একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিতর্কটি বাংলাদেশ ব্যাংক পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছে। যোগান বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিক্রি করছে। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় হারের তুলনায় বাংলাদেশের বাজারের কোন সামঞ্জস্যকর পরিস্থিতি এখনও চোখে পড়েনি। কারণ ডলারের বিপরীতে ইউরো, ভারতীয় রুপি, থাই বাথের মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের পদক্ষেপের খুব সামান্য প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে। নভেম্বর ২০০৬ এর তুলনায় নভেম্বর ২০০৭-এ ডলারের বিপরীতে ইউরো, রুপি ও বাথের মূল্যমান যথাক্রমে ১২.২৮, ১২.০৬ এবং ৭.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ দিয়ে আগামী তিন বা সাড়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় বহন সম্ভব। আশা করা যায় আন্তর্জাতিক বাজারের খাদ্য ও তেলের অধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে বছরের বাকি সময়ে আমদানি ব্যয় আরও বাড়বে। সেই সাথে রপ্তানিও এই প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে ব্যর্থ হবে। এই প্রেক্ষিতে অধিক মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রার ছাড় দেওয়া কোনোভাবেই একটি শক্তিশালী নীতি হতে পারে না। বরং এই মুহূর্তে মুদ্রা বিনিময় হারকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রাখাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য একটি আদর্শ নীতি হতে পারে।

২.৩ প্রকৃত খাত

২.৩.১ কৃষি

২.৩.১.১ খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে ২.৯৭ শতাংশ বেশি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪.৬ শতাংশ কম। উলেখ্য যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের পেছনে ছিল অধিক চালের উৎপাদন। যদিও গমের উৎপাদন ১৯৯৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৩ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন (আউশ ২২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন, আমন ১ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, বোরো ১ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন) যা বিগত অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায় ১৫.০৪ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের আউশ ধান কাটা শেষ হয়েছে এবং আমন ধান কাটা শেষ পর্যায়ে থাকলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আউশ এবং আমন উৎপাদনের কোন প্রকার তথ্য প্রকাশ করেনি। পরপর দু'দফা বন্যা এবং প্রলয়ংকরী সিডরের কারণে এবারের আউশ এবং আমন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ২০ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমানে কৃষকরা বোরো ধানের আবাদ শুরু করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বোরো উৎপাদন সম্পর্কে কোন প্রক্ষেপণ করেনি। সংশি-ষ্টপ্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন– বিবিএস, ডিএই এবং স্পারসো) যৌথভাবে জরুরি ভিত্তিতে আউশ ও আমন উৎপাদনের হিসাব এবং বোরো উৎপাদনের প্রক্ষেপণ প্রকাশ করা দরকার। চাল সংগ্রহ কর্মসূচি ও আমদানি নীতিতে এ তথ্য সহায়ক হবে।

বর্তমান খাদ্যশস্যের সংকট মুহূর্তে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন না থাকার কারণে

চিত্র ১.১: ২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রক্ষেপণ

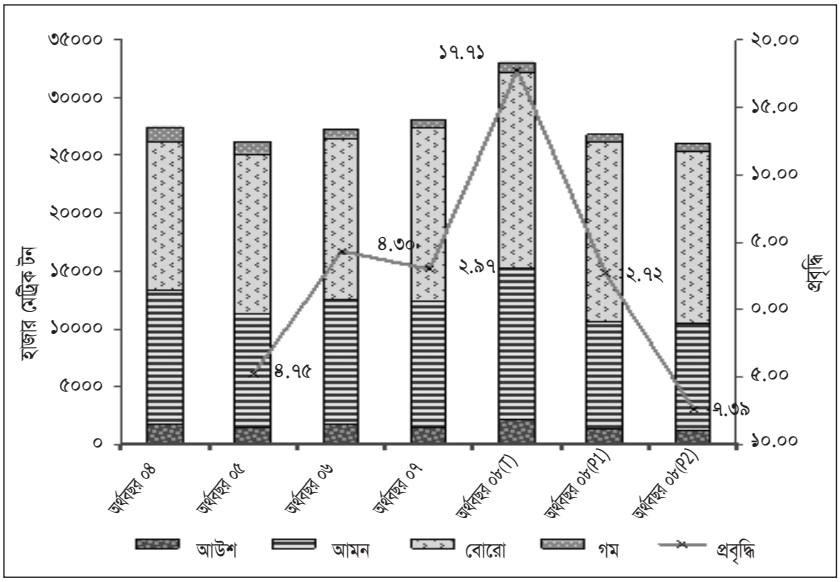

সিপিডি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রক্ষেপণ করেছে (চিত্র ১.১)। সিপিডির হিসেব অনুযায়ি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ২ কোটি ৬০ লাখ থেকে ২ কোটি ৬৮ লাখ মেট্রিক টনের মধ্যে হতে পারে (আউশ: ১৩-১৪ লাখ মেট্রিক টন, আমন: ৯০ লাখ থেকে ৯০ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন, বোরো: ১ কোটি ৪৮ লাখ থেকে ১ কোটি ৫৫ লাখ মেট্রিক টন)। অর্থাৎ খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন গত অর্থবছরের তুলনায় ১২-২০ লাখ টন (৪.৪ শতাংশ থেকে ৭.৪ শতাংশ) কম হতে পারে। আউশ, আমন এবং বোরোর উৎপাদন প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপনের জন্য সিপিডি বন্যা ও সিডরের ক্ষতি, সারের পরিস্থিতি, ডিজেলের উচ্চমূল্য, সেচের জন্য বিদ্যুতের প্রাপ্যতা এবং কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়গুলো বিবেচনা করেছে।

গত আমন মৌসুমের সময় বন্যা ও সিডরের ক্ষতি ছাড়াও কিছু এলাকায় সারের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এ কারণে মানিকগঞ্জ ছাড়াও অন্য কিছু এলাকায় কৃষকেরা মিছিল বের করে। যদিও পরবর্তিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিশেষ কিছু পদক্ষেপের জন্য এ সমস্যার সমাধান হয়। চলতি রবি মৌসুমে বোরো ধান এবং অন্যান্য রবি শস্যের উৎপাদনের জন্য সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হবে সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া সেচের জন্য ডিজেল ও বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহও হবে আরেকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। উলেখ্য যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বল্পতা একটি প্রধান সমস্যা ছিল। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে সেচের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল ৩৯.৬৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা যা ২ বছর আগের অর্থাৎ ২০০৩-০৪ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় (৭৮.৮০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা) অর্ধেক। বর্তমান বছরে যেন এধরনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি না হয়। সরকার সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলে ৭৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ভর্তুকি সহায়তা একর প্রতি ৭০০ টাকা করে উপ-সহকারি কৃষি অফিসার (পূর্বে বক সুপার ভাইজার বলা হত) এবং স্থানীয় সরকার সদস্যদের (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য) মাধ্যমে বন্টন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। ২০০৮ সালের জানুয়ারি-মে সময়কালে এ ডিজেল ভর্তুকি বন্টন করা হবে। কৃষকদের প্রয়োজন বিবেচনায় মার্চ মাসের মধ্যে ডিজেল ভর্তুকি দরকার।

২.৩.১.২ খাদ্য সাহায্য ও আমদানি

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য আমদানি মূলত দুই ভাবে হয়ে থাকে, খাদ্য সাহায্য হিসেবে এবং বাণিজ্যিক আমদানি হিসেবে। বাণিজ্যক আমদানি সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে মোট (খাদ্য সাহায্য ও বাণিজ্যিক আমদানি) চাল আমদানির পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন যার মধ্যে সরকারিভাবে ১ লাখ ১ হাজার মেট্রিক টন এবং বেসরকারিভাবে ৭ লাখ ২৬ হাজার মেট্রিক টন আমদানি হয়েছে (সারণী ১.১)। বিগত অর্থবছরের একই সময়কালে বেসরকারিভাবে আমদানি হয়েছিল মাত্র ১ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে বেসরকারিভাবে গম আমদানি হয় ৮ লাখ ৯১ হাজার মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরের তুল্য সময়কালে ছিল ৯ লাখ ৯৭ হাজার মেট্রিক টন। সামগ্রিকভাবে বর্তমান অর্থবছরের

সারণী ১.১: ২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্য-শস্য আমদানি

('০০০ মেট্রিক টন)

আমদানি শ্রেনী বিন্যাস	অর্থবছর ২০০৬-০৭ (জুলাই-ডিসেম্বর)			অর্থবছর ২০০৭-০৮ (জুলাই-ডিসেম্বর)		
	চাল	গম	মোট খাদ্যশস্য	চাল	গম	মোট খাদ্যশস্য
খাদ্য সাহায্য	২৫	৩১	৫৬	১৭	১০২	১১৯
সরকারি বাণিজ্যিক আমদানি	০	০	০	১০১	০	১০১
বেসরকারি আমদানি	১৪৩	৯৯৭	১১৪০	৭২৬	৮৯১	১৬১৭
মোট	**১৬৮**	**১০২৮**	**১১৯৬**	**৮৪৪**	**৯৯২**	**১৮৩৭**

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর

জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে মোট খাদশস্য ও চাল আমদানির পরিমাণ বিগত অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় যথাক্রমে ৫৩.৬ এবং ৪০২.৫ শতাংশ বেশি ছিল।

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় খাদ্যশস্যের অধিক আমদানি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় আমদানির পরিমাণ ছিল অনেক কম। তাই বাজারে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার ২০০৮ সালের ৫ জানুয়ারি ১০ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম বৃহৎ আকারের আমদানির জন্য বিশেষ আমদানি পদ্ধতি প্রয়োজন হবে। এজন্য সরকার একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারে যার কাজ হবে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল আমদানি করা।

২.৩.১.৩ চালের মূল্য

মূলত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের শুরুতেই মোটা চালের পাইকারি বাজারে দাম বাড়তে থাকে (চিত্র ১.২)। জুলাই ২০০৭-এ ছিল টন প্রতি ১৮ হাজার ৭০০ টাকা তা ডিসেম্বর ২০০৭ এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে টন

চিত্র ১.২: বাংলাদেশে মোটা চালের গড় পাইকারি দাম

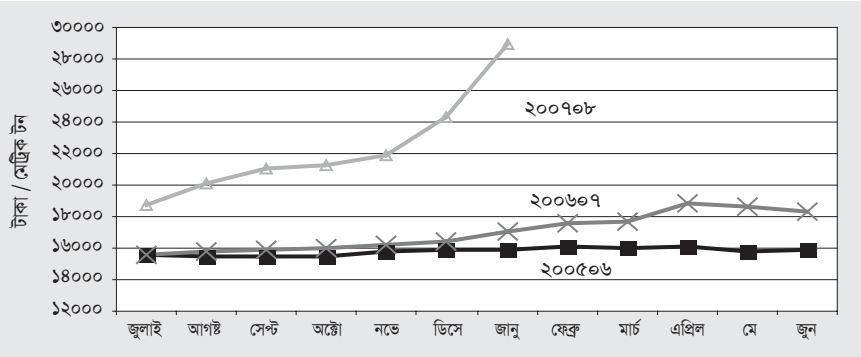

চিত্র ১.৩: বাংলাদেশে চালের দাম এবং বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানি ২০০৩-২০০৭

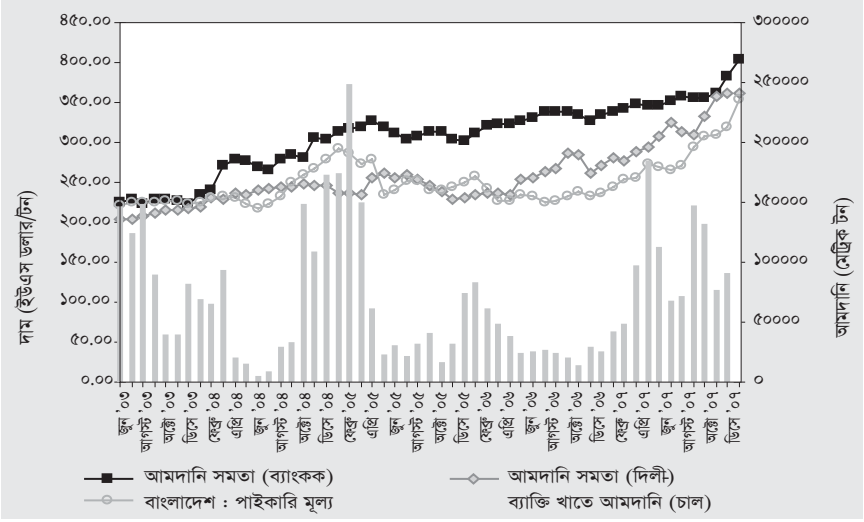

প্রতি ২৪ হাজার ২ শত ৯০ টাকা এবং তা পুনরায় বেড়ে ২০০৮ সালের ১ম সপ্তাহে দাঁড়িয়েছিল টন প্রতি ২৯ হাজার টাকা। বিশ্ববাজারে চালের দাম অভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় আরও বেশি ছিল। মোটা চালের পাইকারি দামের সাথে দিলি-এবং ব্যাংককের আমদানি সমতা দামের তুলনা করলে দেখা যায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১ম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট ২০০৭) ঢাকার দাম দিলী এবং ব্যাংককের তুলনায় অনেক কম ছিল (চিত্র ১.৩)। পরপর দু'বার বন্যায় উৎপাদন যখন ব্যাহত এবং অভ্যন্তরীণ দাম যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণে চাল আমদানি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে কোন বাধা ছিল না। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশ চাল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে, যা ক্রমসারণীতে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন দেশ কর্তৃক চাল রপ্তানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ

- ৬ জুলাই ২০০৭: বিশ্বের শীর্ষ দুই চাল রপ্তানিকারক দেশ থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মধ্যে চাল বাণিজ্যে দাম-যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে সমন্বয়ের জন্য ৩ দিনের আলোচনা শুরু।
- ৬ জুলাই ২০০৭: জাপানী চাল আমদানির ওপর চীন চার বছরের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
- ২৬ জুলাই ২০০৭: চীন সরকার প্রধান প্রধান শস্যের ওপর রপ্তানি কর আরোপ করে।
- আগস্ট ২০০৭: বিগত আড়াই বছর ধরে পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গম রপ্তানিতে বাধা আরোপ করে আসছে।
- ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭: ইন্দোনেশিয়ার সরকার চাল আমদানির ওপর শুল্ক কেজি প্রতি ৪৫০ থেকে ৫৫৫ রুপি (কেজি প্রতি ০.০৫-০.০৬ মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি করে।
- ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭: ভিয়েতনাম পরবর্তী বছর পর্যন্ত চাল রপ্তানিতে চুক্তি স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ৯ অক্টোবর ২০০৭: ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক কেবিনেট কমিটি বাসমতি ছাড়া অন্যান্য চালের রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।
- ২৫ অক্টোবর ২০০৭: ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক কেবিনেট কমিটি বাসমতি ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কিন্তু বিশ্ববাজারে চাল রপ্তানিতে সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য প্রতি টনে ৪২৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে।
- ২ ডিসেম্বর ২০০৭: ভারত সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি বাধা তুলে নেয় কিন্তু বাংলাদেশকে সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে চাল আমদানি করার শর্ত জুড়ে দেয়।
- ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭: চীনের অর্থ মন্ত্রণালয় গম, ভুট্টা, চাল, সয়াবিন এবং ময়দার রপ্তানিতে রেয়াত মূল্য সংযোজন কর বাতিল করে এবং ডিসেম্বর ২০ ডিসেম্বর তারিখ থেকে কার্যকারিতার ঘোষণা দেয়।
- ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭: ভারতীয় সরকার প্রতি টন চালের রপ্তানি মূল্য ৪২৫ মার্কিন ডলার থেকে ৫০০ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ৩ জানুয়ারি ২০০৮: ভিয়েতনাম ২০০৬ সাল থেকে কম্বোডিয়ার চাল করবিহীন আমদানি করার অনুমতি পায়। বর্তমানে ভিয়েতনাম এই সীমা ২০০৯ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।
- ৪ জানুয়ারি ২০০৮: বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে প্রায় ৫ হাজার চালের মিল ধানের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি এবং অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে ধীর গতিতে চলমান বা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

২.৩.১.৪ পশুসম্পদের উৎপাদন

২০০৭ সালের বন্যা এবং সিডরের কারণে পশুসম্পদের উৎপাদন অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী সিডরের জন্য ১ লাখ ৮ হাজার গরু, মহিষ ও ছাগল এবং ২৫ লাখ ৭ হাজার হাঁস-মুরগি মারা যায়। পাশাপাশি ৬ হাজার পশুসম্পদ এবং পোল্ট্রি খামারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব মিলিয়ে পশুসম্পদ খাতে সিডরের ক্ষতি প্রায় ১৩২.২৬ কোটি টাকা। এজন্য সরকার এখনও পর্যন্ত তেমন কোন বৃহৎ আকারে পুনর্বাসন কর্মসূচি নিতে উদ্যোগী হয়নি। বন্যা ও সিডরের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার এবং এনজিও একটি কার্যকর পুনর্বাসন কর্মসূচির উদ্যোগ নিতে পারে– যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গবাদিপশু, গরু-ছাগলের বাচ্চা, বিনামূল্যে গবাদি পশুর খাবার, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা এবং নিম্ন সুদে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে পোল্ট্রি খাতের কিছু অংশে 'বার্ড ফ্লু' আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উলেখ্য যে, বিগত অর্থবছরেও বার্ড ফ্লু আক্রমণের কারণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন– আক্রান্ত খামারগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে মুরগী নিধন এবং মাটি চাপা দেওয়া, আক্রান্ত খামারগুলোতে মানুষের চলাচলে, এবং ভাইরাস মুক্ত খামারগুলিতে যাতে রোগ না ছড়াতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিকারের চেষ্টা করেছিল। যেহেতু বার্ড ফ্লুর আশঙ্কা এখনো দূরীভূত হয়নি সেহেতু সরকারের কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ১০ শতাংশ পোল্ট্রি খামার বার্ড ফ্লু ক্ষতির আওতায় বিবেচনা করা হয় তবে প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা । সুতরাং বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে এবং পোল্ট্রি খাত উন্নয়ন সংক্রান্ত দু'টি প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নসহ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অনুমোদিত ৪০ কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে যে কোন প্রকার মহামারি প্রতিরোধে ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের পোল্ট্রি খামার এবং বৃহৎ সংখ্যক পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারী মিলসমূহে প্রায় ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এসব লোকের কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যের ওপর বার্ড ফ্লুর ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

২.৩.১.৫ মৎস্য উৎপাদন

পর পর দু'বারের বন্যা ও প্রলয়ংকরি সিডর মৎস্য উপখাতকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উপকূলবর্তী মৎস্য বিশেষ করে চিংড়ি খামারগুলি ছিল অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তবে সিডর এমন এক সময়ে আঘাত হানে যখন বাগদা চিংড়ির মৌসুম ছিল না। তা সত্ত্বেও, যেসব মৎস্য খামারি পুকুরে গলদা চিংড়ি ও মিঠাপানির মাছ চাষে বিনিয়োগ করেছে সেসব কৃষকের চরম ক্ষতি হয়েছে। এসব কৃষক তাদের বিনিয়োগের অধিকাংশই সংগ্রহ করেছিল ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণের মাধ্যমে।

সিডর আক্রান্ত উপকূলবর্তী এলাকার কিছু পুকুর তলিয়ে মাছ ভেসে খাল ও নদীতে চলে যায়। বাকি পুকুরগুলোতে গাছের পাতা পঁচে পানি দূষিত হয়ে মাছ মারা যায় এবং পরবর্তী কিছুদিনের জন্য পুকুরগুলি মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। উক্ত এলাকার মধ্যে বাগেরহাট জেলায় মাছ উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ ছিল অধিক। মৎস্য উপখাতের এ ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য একটি বড় আকারের পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রয়োজনে। এ কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে কারিগরি সহায়তা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরে পুনরায় চাষাবাদ সম্পর্কে জ্ঞান ও ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

২.৩.২ শিল্প

২০০৬-০৭ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্প ক্ষেত্রে নিম্ন প্রবৃদ্ধি হারের গতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। গত ৯ মাসে শিল্প উৎপাদনের (শিল্প উৎপাদন সূচক

সংখ্যা বা QIP) নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত স্পষ্ট (সারণী ১.২)। গত বছরের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭ সময়কালে শিল্প উৎপাদন কমেছে ৮.১ শতাংশ, এপ্রিল-জুন ২০০৭ সময়কালে ৬.১ শতাংশ এবং এমনকি জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ সময়কালে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (−১.০ শতাংশ) হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নতুন ভিত্তি বছর (Weight) (নতুন ভিত্তি বছর ২০০০/০১, পূর্বের ভিত্তি বছর ছিল ১৯৮৯/৯০) ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদনের সূচক সংখ্যা প্রাক্কলন করেছে এ উদ্যোগটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্মরণ করা যেতে পারে, সিপিডি অতীতে শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন সাপেক্ষে একটি পুনঃপরীবিক্ষণের সুপারিশ করেছিল (বাংলাদেশ অর্থনীতির পর্যালোচনা ২০০৪-০৫ এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা ২০০৫-০৬)। যদিও পুরাতন ভিত্তি বছর (Weight) অনুযায়ী হিসেব করলে, শেষ তিন চতুষ্টকে সামগ্রিক শিল্প উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতি একই ছিল। (২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম চতুষ্টকের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক নয়) বিশেষকরে ২০০৮ অর্থবছরের প্রথম চুতষ্টকের এরকম দুর্দশার প্রধান কারণ তৈরি পোশাক, চামড়া, পাট ও তুলার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের দ্বিতীয় চতুষ্টকের শিল্প উৎপাদনের পরিস্থিতি তথ্য প্রাপ্যতার অভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের অক্টোবর সময়কালে তৈরি পোশাকের উচ্চমাত্রার রপ্তানি থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময় তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম চতুষ্টকে অন্যান্য সকল শিল্প উৎপাদনে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল, যদিও অধিকাংশ শ্রেনীর নিম্নগামিতা পূর্ববর্তী চতুষ্টকেই স্পষ্ট ছিল।

মেয়াদি শিল্প ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা আশান্বিত হতে পারি, কেননা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে উক্ত বন্টন ছিল গত বছরের একই সময়কালের তুলনায় অনেক বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম চতুষ্টকে মোট ৩৭৮৪.৭ কোটি টাকা বণ্টন এবং ২৬২৫.২ কোটি টাকা পরিশোধিত হয়েছে যা গত অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় যথাক্রমে ৪২ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম চতুষ্টকে ব্যক্তিখাতে ব্যাংকের অগ্রিম প্রদানের তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায়– বিভিন্ন ধরনের শিল্প কার্যক্রম যেমন: প্রকল্পের অর্থসংস্থান, চলতি মূলধনে অর্থসংস্থান, নির্মাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং বাণিজ্য কার্যক্রম ইত্যাদি

সারণী ১.২: শিল্প উৎপাদন প্রবৃদ্ধি সূচক (প্রধান শিল্প অনুসারে)

উপ-খাত	নতুন ভিত্তি (ভিত্তি ২০০০-০১)	পুরানো ভিত্তি (ভিত্তি ১৯৮৯-৯০)	অর্থবছর ২০০৬-০৭				অর্থবছর ২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
খাদ্য, পানীয় এবং তামাক	২২.১	৯.৭	৪.৭	৩.১	৮.৩	৬.৫	২.৬
পাট, তুলা, তৈরি পোশাক এবং চামড়া	৩৮.২	৬৮.১	৪.১	১৭.৪	৮.৪	৬.১	২.৮
কাঠের তৈরি আসবাবপত্র	০.২	০.১	৩.৮	৯.৪	৬.৪	১০.৮	১২.৭
কাগজ এবং কাগজের তৈরি দ্রব্যাদি	৪.৭	১.১	৭.৯	৩.২	১৭.৩	১৬.৭	১৭.৯
রাসায়নিক পেট্রোলিয়াম এবং রাবার	২৪	১৫.৬	৩.৫	৫.৮	৫.৬	৫.৩	৫.৪
অধাতু দ্রব্যাদি	২.৮	৩.৭	৩.৭	৫	৫.৭	৫.৩	৩.৪
ধাতব দ্রব্যাদি	২.১	০.৭	২.৭	১৪	১১.৯	৯.৯	৯.৬
ধাতু নির্মিত দ্রব্যাদি	৫.৯	১	৩.৪	৯.৬	১০.৬	৮.৩	৯.৯
প্রবৃদ্ধি (নতুন ভিত্তি)	১০০	১০০	৩.২	১৩.৪	৮.১	৬.১	৯
প্রবৃদ্ধি (পুরানো ভিত্তি)			২.১	১০.৫	৮.৩	৬.৭	১.৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

ধনাত্মক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে (সারণী ১.৩)। তা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ প্রথম চতুষ্টকে বৃদ্ধি পেয়েছে (চলতি অর্থ বছরের প্রথম চতুষ্টকে মোট অনাদায়ী ১৬.৭ শতাংশ– যার পরিমাণ গত অর্থবছরে একই সময়কলে ১৪.২ শতাংশ ছিল), যা সম্ভবত বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশেরই প্রতিচ্ছবি।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম চতুষ্টকে মূলধনী দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি গত বছরের একই সময়কালের তুলনায় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট আমদানি ঋণপত্রের (এলসি) সাথে সম্পর্কিত এলসি খোলা, নিষ্পত্তি ও অনাদায়ী এলসিসমূহ কম হওয়ার কারণে মূলধনী যন্ত্রাংশের আমদানি একই সময়কালে কম হয়েছে (সারণী ১.৪)। শিল্পের কাঁচামাল এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য যন্ত্রাংশ আমদানি (এলসি খোলা, নিষ্পত্তি ও অনাদায়ী এলসিসমূহের ক্ষেত্রে) ২০০৭ সালের জুলাই-অক্টোবর সময়কালে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল (সারণী ১.৫)। এলসি খোলা, নিষ্পত্তি এবং অনাদায়ীর ক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রাংশের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০০৭ সালের জুলাই-অক্টোবর সময়কালে যথাক্রমে −৭.২ শতাংশ, −৮.৩ শতাংশ এবং −৫.৮ শতাংশ ছিল। যা চলতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতিময়তা নির্দেশ করে। কিন্তু সে সময় উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল না।

সারণী ১.৩: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুসারে বেসরকারি খাতে ব্যাংক অগ্রিম প্রদানের প্রবৃদ্ধি

(বিলিয়ন টাকা)

খাত সমূহ	অর্থবছর ২০০৭-০৮				অর্থবছর ২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
শিল্প (চলতি মূলধন ব্যতিত)	২৬.৩	৩২.২	২৫.৭	২৩.৪	২০.২
পাট, তুলা, তৈরি পোশাক এবং চামড়া	১০.৬	১৩.২	৯.০	১১.৯	১০.৯
নির্মাণ	১৬.৮	১৬.৬	১৪.৪	২১.৮	১৭.৫
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪০.১	৩১.৯	২৫.৩	৫২.৮	৫১.৬
গুদামজাতকরণ	১৯.৪	২০.০	২.৬	২৭.২	২৭.৯
বাণিজ্য	৮.১	১৬.০	৮.৫	১৩.৯	১৩.৩

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১.৪: অর্থবছর ২০০৬-০৭ এবং অর্থবছর ২০০৭-০৮ এ (Q1 অনুসারে)
বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

উপাদান	Q1, অর্থবছর ২০০৬০৭	Q1, অর্থবছর ২০০৭০৮	শতাংশে পরিবর্তন
খাদ্যশস্য	৭৮	২৬৫	২৩৯.৭
অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য	৩১২	৪৭৩	৫১.৬
ভোক্তা এবং মধ্যবর্তী দ্রব্য	১৮৯৯	২০৪৮	৭.৮
মূলধনী দ্রব্য ও অন্যান্য	১৪৩৪	১৬৩১	১৩.৭
ইপিজেড কর্তৃক আমদানি	২৪৭	২৭১	৯.৭
সর্বমোট	**৩৯৭০**	**৪৬৮৮**	**১৮.১**

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণী ১.৫: খাত ভিত্তিক আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বর্তমান চালু ঋণপত্রের তুলনামূলক চিত্র

খাত/পণ্য	জুলাই-অক্টোবর ২০০৬ থেকে জুলাই-অক্টোবর ২০০৭ পর্যন্ত পরিবর্তনের শতকরা হার		
	নতুন আমদানি ঋণপত্র খোলা	আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তি	এ সময়ের শেষে বর্তমান চালু আমদানি ঋণপত্র
ভোগ্য পণ্য	৯৯.৪	১০১.৫	৬৭.৮
মধ্যবর্তী দ্রব্য	১৯.৮	৩০.৬	২৬.৮
শিল্প কাঁচামাল	২৯.০	১৮.৬	২৩.৩
শিল্প যন্ত্রাংশ	৭.২	৮.৩	৫.৮
অন্যান্য শিল্পের যন্ত্রাংশ	১৭.৫	১৩.৮	৭.১
পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩৩.০	১৬.৭	৩৪.৩
অন্যান্য	৪০.৫	২০.১	১৪.৭
মোট	**২৩.৯**	**১৮.২**	**২০.২**

বাংলাদেশের পাট খাত নিয়ে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধের একটি বহুল আলোচিত পদক্ষেপ। পাট খাতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে চার ধাপে তিন বছর মেয়াদি সংস্কার পরিকল্পনা (প্রশাসনিক, শিল্প, আর্থিক এবং বাজার ব্যবস্থাপনা), বিদ্যমান ২২টি সরকারি কারখানার মধ্যে ৪টি এবং ১৪২টি পাট সংগ্রহকেন্দ্রের মধ্যে ৮৪টি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া চালু কারখানাগুলো থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে স্বেচ্ছা অবসর পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৪,০০০ কর্মচারীকে ছাঁটাই করা, 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' সুবিধা, পারিতোষিক, ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদির জন্য সর্বমোট ১৩৬৭ কোটি টাকা দেওয়া। ২০০৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যে কাঁচা পাট সংগ্রহ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাবনা পাঠানো, বিজেএমসি'র কারখানায় ১৩৮ কোটি টাকার তারল্য সরবরাহের জন্য ব্যাংকের কাছে ঋণ ও অঙ্গীকারপত্র বিতরণ এবং তহবিল গঠনের জন্য বিজেএমসি'র ১২০ একর জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্তও এর মধ্যে রয়েছে। শ্রমিক, বেসরকারি সংস্থাসহ প্রধান স্বার্থ সংশিষ্ট গোষ্ঠী সরকারি ব্যবস্থাপনায় পাটকলগুলো বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উলেখ্য যে, সরকার এখনও বন্ধ পাটকলের শ্রমিকদের বকেয়া প্রদান করেনি। যখন বিশ্বে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদার পুনরুত্থান হচ্ছে তখনই সরকার এসব সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছে। এসব বিবেচনায় সিপিডি পাট চাষের অর্থনীতি, পাটজাত পণ্য উৎপাদন দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের প্রতিযোগিতা পরিস্থিতি উৎঘাটনের উদ্দেশ্যে, 'বাংলাদেশের পাটখাত সমস্যা, সম্ভাবনা এবং কর্মপন্থা' নামে একটি গবেষণা শুরু করেছে।

সাধারণভাবে গত তিন চতুষ্টক ধরে শিল্প খাত তার কর্মশক্তি প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রথম চতুষ্টকে। যার প্রথম কারণ হচ্ছে, ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাইডি সেম্বর ২০০৭) রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশে তাদের অর্ডার কম দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ছিল (জানুয়ারিজুন ২০০৭) শ্রমিক অসন্তোষ। দ্বিতীয়ত– বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, যেমন– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবৈধভাবে মজুদ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য জমি দখল, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা, ব্যাংক লেনদেনের বৈধ সীমা অতিক্রম, সম্পদের বিবৃতি প্রকাশ না করা, কর খেলাপী ইত্যাদি কারণে প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্পোরেট গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং মাশুল আদায়। এগুলো স্বল্প সময়কালের বিনিয়োগ ও উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল– যদিও উক্ত পদক্ষেপ মধ্যমেয়াদ থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদে

গ্রহণযোগ্য দক্ষ সরকার গঠনে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত– দেশীয় বাজারে নিয়মিত উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে ব্যবসায়িক প্রসারণ বিশেষ করে শ্রমনির্ভর শিল্পোদ্যোগে অনীহা। চতুর্থত– নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তাও ব্যবসায়িক আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে আশার বিষয় হল প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবসায়িক ফোরাম (better business forum) এবং রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন সংশিষ্ট ব্যবসায়ীদের এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ব্যবসার প্রতি পুনরায় আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।

বিগত কয়েক মাস ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি ইতিবাচক অর্জন। এই সময়কালে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং উলেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে নিউ মুড়িং কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরি হওয়ার পর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বার্ষিক ৫ লাখ টিইইউ (Twenty Feet Equivalent Units) কন্টেইনারের পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিউ মুড়িং কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

২.৩.৩ বৈদেশিক বিনিয়োগ

২০০৭০৮ অর্থবছরের জুলাইঅ ক্টোবর সময়ে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ১১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৩১১ মিলিয়ন ডলারে যার মধ্যে ২৬৩ মিলিয়ন ডলার এসেছে নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে এবং বাকি ৪৮ মিলিয়ন ডলার এসেছে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ থেকে। হতাশাব্যাঞ্জক অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মধ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ গত বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ কমে গেছে। পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ২০০৬০৭ অর্থবছরের জুলাইঅ ক্টোবর সময়কালের ৬ মিলিয়ন ডলারের থেকে ২০০৭০৮ অর্থবছরের একই সময়ে ৪৮ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই পরিবর্তন সাম্প্রতিককালের পুঁজিবাজারের তেজিভাবেরই ফলশ্রুতি।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই নিম্নগামীতা নিরাশাব্যাঞ্জক ধারণাকে প্রতিফলিত করে। বৈদেশিক বিনিয়োগ নিবন্ধনের সংখ্যা কমে গেছে যা বাংলাদেশের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হ্রাসের পরিচায়ক। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে অমীমাংসিত বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলো সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং বিনিয়োগ নিরুৎসাহী বিষয়সমূহ বিশেষত অবকাঠামোগত এবং নিয়ন্ত্রণকারী কৌশলগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অতিসত্ত্বর যদি কয়লানীতি অনুমোদন করা যায়, তবে শক্তি নিরাপত্তার জন্য তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

যেহেতু বেশ কয়েকটি প্রস্তাব সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে, সেহেতু দেশের দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নিরাপত্তার জন্য সরকারকে একটি বড় মাপের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক দরপত্র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ সত্ত্বেও এর গতি বৃদ্ধি পায়নি। বিদ্যুৎ শক্তি সংক্রান্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিনিয়োগকে বাড়াতে ও সহজতর করতে বিনিয়োগ বোর্ডের কাজকে একটি সাংগঠনিক ম্যান্ডেট হিসেবে ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের ওয়ান স্টপ সেবা বেশ গুরুপত্বপূর্ণ। আরআরসির গৃহীত বিনিয়োগ বোর্ডের সাথে নতুন বিনিয়োগের জন্য অনলাইন নিবন্ধীকরণ একটি ভাল পদক্ষেপ। এজন্য বিনিয়োগ বোর্ডের ইন্টারনেট সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে সুসংহত করতে হবে। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠেয় প্রবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) কনফারেন্স ২০০৭এর ম তো পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতা নীতি, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কারণে আশা করা যায় দেশে ব্যবসা পরিবেশের উন্নতি হবে।

২.৩.৪ পুঁজি বাজার

২০০৬০৭ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের স্টক মার্কেটে যে গতির সঞ্চার হয়েছিল ২০০৭০৮ অর্থবছরে তা বহাল আছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সব ধরনের শেয়ার মূল্য সূচক ২০০৭০৮ অর্থবছর বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাইঅ ক্টোবর সময়ের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল মূল্যসূচক ৭৪৯.২২ পয়েন্ট (৪১.১ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে। DGEN এবং DSE20 যথাক্রমে ৮২৬.৭৫ পয়েন্ট (৩৭.৭ শতাংশ) এবং ৫৮৮.৩১ পয়েন্ট (৩১ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে গত অর্থবছরের প্রথমার্ধে পাঁচটি নতুন প্রাথমিক শেয়ার (আইপিও) বাজারে আসে সেখানে এ বছর তিনটি নতুন আইপিও বাজারে এসেছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭ অনুসারে পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪২.২ বিলিয়ন টাকা (গত বছর একই দিনে যা ছিল ৩১৫.৪ বিলিয়ন) যা জিডিপির হারকে ১৫.৯ শতাংশে নিয়ে যায়। যদিও এই হার যথেষ্ট বেশি তবুও তা ভারত (১৩০ শতাংশ) ও পাকিস্তানের (৭৫ শতাংশ) চেয়ে অনেক কম। পুঁজি বাজারে গ্রামীণ ফোন শেয়ার ছাড়বে। আশা করা যায়, অন্যান্য কোম্পানিও গ্রামীণ ফোনকে দেখে পুঁজি বাজারে শেয়ার ছাড়তে উৎসাহী হবে।

পুঁজি বাজারের স্থিতাবস্থা ও যেকোন ধরনের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ এসইসি'র প্রধান দায়িত্ব। বিগত কয়েকমাসে লক্ষণীয়ভাবে এসইসি বাজার স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ফোন ও অন্যান্য বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা বজায় রাখতে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ তৈরি করতে ভিএসই ও সিএমইএর কা র্যের ফলপ্রসূ পর্যালোচনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। উলেখ্য যে সিপিডি বিগত সময়ে বড় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার চালু করার জন্য উৎসাহ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে, ফলে ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের আরও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২.৪ বৈদেশিক খাত

২.৪.১ রপ্তানি

২০০৬ সালের শেষ ভাগে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০০৭ সালের মে মাসে ঘটে যাওয়া শ্রমিক অসন্তোষ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। এ দু'টি কারণের সমন্বিত প্রভাবে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য অন্যান্য দেশে অর্ডার পেতে সমস্যা হয়েছিল। তাই ২০০৭ সালের জুলাইআগ স্ট ওভেন ও নিট রপ্তানির ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৬.৬ শতাংশ ও ১২ শতাংশ। ফলে সামগ্রিক রপ্তানির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল ১২.১ শতাংশ। তবে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর এই সময়কালে রপ্তানি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে এবং রপ্তানি খাতে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৭০৮ অর্থবছরে জুলাইঅ ক্টোবর সময়ে (-) ২.৬৩ হা রে প্রবৃদ্ধি নিয়ে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছিল ৪১২৭.৩ মিলিয়ন ডলার (সারণী ১.৬)।

২০০৭০৮ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ১৯.১ হারে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে ওভেন ও নিটের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫.৯ শতাংশ এবং ২০.০ শতাংশ। জুলাইঅ ক্টোবর সময়কালে রপ্তানি ক্ষেত্রে নিম্নগামীতা আমাদেরকে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। গত বছরের বিবেচনায় অর্থবছরের বাকি সময়কালে ওভেন ও নিট খাতে রপ্তানি যথাক্রমে ২৮.৯ শতাংশ ও ৩১.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে হবে। সামগ্রিকভাবে ২০০৮ অর্থবছরের বাকি আট মাসে ৩০.২ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে চীনের ওপর শেষ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর রপ্তানি খাতে উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি খুব সহজ কাজ হবে না।

সারণী ১.৬: বাকি অর্থবছরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি

	২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	২০০৭০৮ অর্থ বছরের জুলাইঅ ক্টোবর মাসের প্রবৃদ্ধি	বাকি অর্থবছরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি
সকল পণ্য	১৯.১	২.৬৩	৩০.২
পোশাক খাত	১৮.০	৪.৯২	৩০.০
ওভেন	১৫.৯	৯.৩৪	২৮.৯
নিট	২০.০	০.৫৬	৩১.২
পোশাক খাত বহির্ভূত	২২.৫	৫.০৩	৩০.৮

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

২.৪.২ আমদানি

২০০৭০৮ অর্থ বছরে জুলাইঅ ক্টোবরে মোট আমদানির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০ শতাংশ। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের দাম বৃদ্ধিই এই উচ্চমাত্রার কারণ। আমদানি ব্যয় ও আমদানির পরিমাণ বিবেচনা করলে খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টাকার হিসেবে সবচেয়ে বেশি আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল চাল (৫৯৬.৮ শতাংশ), গম (৮৮.৪ শতাংশ) এবং সারে (১০৬.৭ শতাংশ)। এই প্রবৃদ্ধির কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চদাম এবং পরিবহণ খরচ। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং POLএর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক যা কিছুটা বিভ্রান্তিকর।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ৮.০ শতাংশ হারে ধীর গতির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা বর্তমানে বিরাজমান বিনিয়োগ পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করে। অপরদিকে আমদানি নিষ্পন্ন (overall settlement) এবং আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৭.৯ শতাংশ এবং ২৩.৭ শতাংশ (যথাক্রমে- ৮.৩৩ এবং ৭.১৬ শতাংশ), মূলধনী য ন্ত্রপাতি এবং জ্বালানি দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক হার বিদ্যমান ছিল যা বর্তমানের বিনিয়োগের মন্দাভাবেরই বহিপ্রকাশ এবং যা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২.৪.৩ বাণিজ্য শর্ত

২০০৭০৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে বাণিজ্য শর্তের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অবলম্বন করা। যদি ১৯৯৯০০ অর্থ বছরে রপ্তানি দাম ধরা হয় ১০০ তবে গড় রপ্তানি দাম কমে ২০০৬০৭ অর্থ বছরে প্রায় ৮৬ তে এসে দাঁড়িয়েছে। খুবই উদ্বেগের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিককালে সার্বিক দামের হার বাড়লেও বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে তা কমছে। এই বাণিজ্য শর্ত নির্দেশ করে যে, রপ্তানির সমপর্যায়ে আমদানি করতে হলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানের গতিপ্রকৃতিই যদি চলমান থাকে তবে সামনের বছরগুলোতে বাণিজ্য ভারসাম্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে পোশাক রপ্তানি আরও বৃদ্ধির জন্য পোশাক পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, প্রতিবেশি দেশগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং যোগান সংক্রান্ত সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

২.৪.৪ বৈদেশিক সাহায্য

২০০৭০৮ অর্থ বছরের জুলাইঅ ক্টোবর সময়কালে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ ২০০৬০৭ অর্থ বছরের একই সময়কালের তুলনায় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট সাহায্যের অর্ন্তমুখী প্রবাহের পরিমান ছিল ৩৮৯.৭ মিলিয়ন যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। With payment (principle) ব্যয় সীমা একই স্তরে থাকাকালীন সময়ে নিট বৈদেশিক সাহায্যের অন্তর্মুখী প্রবাহের পরিমাণ উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার হার ৯০৩.৬ শতাংশ। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে ৩৬.০ মিলিয়ন ডলার সমমানের খাদ্য সাহায্য এসেছে এবং গত অর্থবছরে একই সময়ে কোন ধরনের সাহায্য পাওয়া যায়নি।

বাজেটের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব খাতের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির গতি ভালো থাকলেও পরবর্তী আট মাসে আরও ১.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারের জরুরি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা থাকায় বাজেটের সহায়তার আদলে বিশ্বব্যাংকের DSC IV এর মতো বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নতুন নতুন উৎস খুঁজে বের করা দরকার।

২.৪.৫ রেমিটেন্স

২০০৬০৭ অর্থ বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রথম কয়েক মাসে রেমিটেন্স পাওয়ার সার্বিক পরিস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে জুলাইন ভেম্বর সময়কালে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৮০৬.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২১.৭ শতাংশ। নভেম্বর মাসে প্রবাহের পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং প্রথমবারের মত ৬০০ মিলিয়ন ডলারে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই রেমিটেন্স প্রবাহকে আরও উৎসাহিত করার জন্য আধাদ ক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের বেশি করে অভিবাসনে আগ্রহী করার জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

২.৪.৬ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

২০০৭০৮ অর্থ বছরের সমকালীন তথ্যউপা ত্ত বিশেষণ করলে দেখা যায়, নভেম্বরের শেষে গত অর্থবছরের একই সময়ে ৪৪.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৫০৯৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মধ্য নভেম্বরে ACU (এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিট) ব্যয় ৪৬২.৩ মিলিয়ন ডলার হলেও চলতি রিজার্ভ গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি, যা সাধুবাদ জানানোর যোগ্য। এই প্রশংসনীয় সাফল্যের পর কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ACU ব্যয় দ্বিতীয় ধাপে জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত মুলতবি আছে। এছাড়া সামনের সময়ের উচ্চ আমদানির প্রয়োজনীয়তা বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। একই সময়ে উচ্চমাত্রার চলতি রিজার্ভ থাকার পরও ২০০৭০৮ অর্থ বছরের অক্টোবরের রিজার্ভের পরিমাণ ৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ। তাই বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পরিস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২.৪.৭ বাণিজ্য সমতা

২০০৭০৮ অর্থ বছরের জুলাইঅ ক্টোবর মাসের তুলনায় ২০০৬০৭ অর্থ বছরের একই সময়ে লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। মূলত বাণিজ্য ভারসাম্যের অবনতির কারণে এমনটি হয়েছে। এসময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ে। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭৩৯ মিলিয়ন ডলার, যা কিনা গত

অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় (৬৭৭ মিলিয়ন ডলার) অনেক বেশি। এসময়ে রেমিটেন্স প্রবাহ অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসেবের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২২৯ মিলিয়ন ডলার। আর্থিক খাতের হিসেবে দেখা যায়, বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে নিট অন্তর্মুখী প্রবাহ ছিল ৪৫৬ মিলিয়ন ডলার এবং বহিঃপ্রবাহ ছিল ৮৮ মিলিয়ন ডলার। সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২০ মিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের তুল্য সময়ে ছিল ৮২ মিলিয়ন ডলার।

আগামী মাসগুলোতে প্রবাসীদের উচ্চহারে রেমিটেন্স প্রেরণের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমদানি ব্যয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেলে এবং রপ্তানি প্রবাহের অবনতি অব্যাহত থাকলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি চাপ পড়তে পারে।

৩. ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের পরবর্তী ছয় মাসের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেট বিশেষণে সিপিডি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আশু করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে প্রথম ছয় মাসের পরিবর্তন (বন্যা, সিডর) কিছু বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করেছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। উলেখ্য যে, সরকার ইতিমধ্যে কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে।

রাজস্ব সংগ্রহ

- রাজস্ব সংগ্রহের গতি বজায় রাখা
- কর নির্ধারণ সহজীকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- যত দ্রুত সম্ভব সর্বজনীন স্বনির্ধারণ কর পদ্ধতি চালু করা
- ভ্যাট নিবন্ধন সহজীকরণ

বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ

- স্থগিতকৃত প্রকল্প সাহায্য দ্রুত অবমুক্ত করার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন
- উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য আলোচনা করা
- যেহেতু লেনদেন ভারসাম্য একটি ভালো অবস্থায় আছে, আইএমএফএর সা থে নতুন ঋণ চুক্তি সুপারিশযোগ্য নয়

সরকারের ব্যাংক ঋণ

- বেসরকারি ঋণ গ্রহণের ওপর চাপ কমাতে সরকারের নিয়ত ব্যাংক ঋণ গ্রহণ বর্জন করতে হবে

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- প্রথম চতুষ্টক থেকেই উদ্যমী সূচনা
- বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া অবলম্বন
- নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের সাথে যোগসূত্রকে সুদৃঢ় করা
- সরকারি-বেসরকারি ও সরকারিএনজিও অংশীদারিত্ব সুসংহতকরণ

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোকে ত্বরান্বিত করা
- বিদ্যুৎ খাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া

বাস্তবায়ন যাচাই ত্বরান্বিত করা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

- সার্বক্ষণিক বাস্তবায়ন অবস্থার পর্যালোচনা করা
- যখনই কোন বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়, তখনই অতিসত্বর সংশোধন করা
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

গুণগত ও সময়োপযোগী অর্থনৈতিক উপাত্তের প্রাপ্যতা

- কর সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার
- গুরুত্বপূর্ণ বাজেট সংক্রান্ত সূচকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও হালনাগাদ করা
- বাজেট সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহারকারীদের জন্য সহজলভ্য করা

২০০৭০৮ অর্থ বছরের পরবর্তী ছয় মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনে দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১ প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি অর্জন

২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ শতাংশ। সিপিডির মতে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে জিডিপির তিনটি প্রধান খাত যেমন– কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান উলেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে খাদ্যশস্যের ক্ষতি কৃষি খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে। গবাদি পশু, হাঁসমুরগি ও মা ছের ক্ষতিও বিশেষভাবে গণ্য। বিগত ছয় মাসে উৎপাদনশীল অন্যান্য খাতসমূহও এ সময় একটি চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শথগতি ছিল। অবশ্য এ সময়কালে মেয়াদি ঋণ বিতরণ হয়েছে অনেক বেশি। এখানে উলেখযোগ্য যে, সিপিডি তার বাজেট বিশেষণে উলেখ করেছিল, ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের তুলনায় জিডিপির শতকরা ১ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। যদি মূলধন উৎপাদনশীলতাকে অপরিবর্তীত রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ শতাংশ হতে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয় তবে মোট বিনিয়োগ আবশ্যকতা জিডিপির ২২.৪ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় বছরের প্রথম নয় মাসে বিনিয়োগ নিবন্ধন (অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উভয়ই) প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ও মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানিও হ্রাস পেয়েছে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবসায়ীমহলের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুসম্পর্ক আনয়নের জন্য 'প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবসায়িক ফোরাম' এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা অপসারনের জন্য রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) গঠন।

জিডিপির প্রতি শতাংশ পতনের অর্থ ৭০০ মিলিয়ন ডলারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। বোঝা যাচ্ছে, পিআরএসপির অধীনে অনুমিত ৭ শতাংশ দূরের কথা, গত বছরের (৬.৫ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি অর্জনই দুষ্কর হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, আয় বন্টন ও দারিদ্র্যের সাথে সংশিষ্ট খাতগুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ২০০৭০৮ অর্থবছরের মধ্যে ৫৮ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের পিআরএসপির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সরকারকে ২০০৬

থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ১০.৭ শতাংশ হারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৃহৎ বৈদেশিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলোও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য রেখে দিয়েছে। যদি আমরা শতকরা ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাই তাহলে এডিপির অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে, অর্থবছরের পরবর্তী সময়ের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.২ পুনর্বাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন

গত কয়েক মাসে বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচির কারণে বাজেট ঘাটতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসাথে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য আগামী মাসগুলোতে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়, সে কারণে সরকারকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কাটছাঁট করে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প ও অনুমোদিত কিন্তু অপ্রদেয় প্রকল্পের অর্থ বন্ধ করে থোক বরাদ্দ থেকে অর্থ সরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার কাজে লাগানো যেতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচি পুনর্গঠনের সময় কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ খাতের ব্যয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২০০৭০৮ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে ২১৮২.২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে ৫.২ কোটি টাকা জুলাইআগ স্ট সময়কালের মধ্যে খরচ হয়েছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন কর্মসূচির অর্থায়নে এ অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকারকে প্রকল্প ব্যয় নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.৩ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রহণ

আগামী মাসগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বোরো মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারিভাবে আমদানি বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিশ্রুত খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য যোগান ও জনমানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করলেই হবে না। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সরকারকে ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্যক্রমকেও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় বাজেট ২০০৭০৮ এ (ভিজিডি, ভিজিএফ ও টেস্ট রিলিফ

সারণী ১.৭: সরকারি খাদ্য বিতরণ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭) ('০০০ মেট্রিক টন)

	২০০৬-০৭ অর্থবছর (জুলাই-ডিসেম্বর)			২০০৭-০৮ অর্থবছর (জুলাই-ডিসেম্বর)		
	বিতরণ	চাল	গম	বিতরণ	চাল	গম
আর্থিক (ওএমএস, ওপি, ইপি, এলই অন্যান্য)	১৯৪	৬৬	২৬০	১৪৬	৪৮	১৯৪
অনার্থিক (এফএফডবিউ, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর, টিআর অন্যান্য)	৪০৪	৪২	৪৪৬	৩৬১	৪৪	৪০৫
মোট	**৫৯৮**	**১০৮**	**৭০৬**	**৫০৭**	**৯২**	**৫৯৯**

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে সিপিডির বিশ্লেষণ।

(টিআর) এবং জিআর কর্মসূচি বাবদ ১৬৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার।

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের পরিকল্পনা সরকারের একটি ভালো অভিপ্রায়। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাইডি সেম্বর) পিএফডিএসএর মাধ্যমে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুল্য সময়ের চেয়ে ১৫ শতাংশ কম ছিল এবং মূল্য বহির্ভূত বিতরণ (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, জিআর, টিআর) ৯ শতাংশ কম ছিল (সারণী ১.৭)। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে পিএফডিএসএর আওতায় মোট খাদ্যশস্য (চাল ও গম) বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুল্য সময়ে ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার মেট্রিক টন। এ থেকে বোঝা যায় সুষ্ঠু খাদ্য বিতরণের জন্য সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় গতি আনতে হবে। উলেখ্য যে, বর্তমান বছরে সরকার পিএফডিএস ছাড়াও বিডিআরএর মাধ্যমে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় করছে। উপরোক্ত বিশেষণে বিডিআরএর মাধ্যমে বিক্রয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ভিজিডি, ভিজিএফ সুবিধাপ্রাপ্ত ও দুঃস্থদের কাছে সঠিকভাবে সহায়তা পৌছানোর জন্য পিএফডিএসএর আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে এবং বিতরণ ব্যবস্থায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

সারণী ১.৮: আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্যের চলতি মূল্য

খাদ্যশস্য	পণ্যের ধরণ	FoB price (US$/t)	Freight rate (US$/t)	Cost (upto Bangladesh: C&F +Tk 1) (Tk/Kg)
চাল (জানুয়ারি	২৫% ভাঙ্গা (পাকিস্তান)	৩৫০	৪৫	২৮.০৯
৭, ২০০৮)	১৫% ভাঙ্গা (থাইল্যান্ড)	৩৫৫	৪৫	২৮.৪৩
	সিদ্ধ (থাইল্যান্ড)	৩৯০	৪৫	৩০.৮৩
	১৫% ভাঙ্গা (ভিয়েতনাম)	৩৬০	৫০	২৯.১২
	ভারত (সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য)	৫০০	৪	৩৫.৫৬
	ভারত (দিলী- পাইকারি মূল্য) সিদ্ধ চাল	৩৬০	৪	২৫.৮৪
গম (ডিসেম্বর.	Hard Red Winter	৩৮৯	৯৫ (US gulf)	৩৪.১৯
১৯, ২০০৭)	Soft Red Winter	৩৫২.৫৫	৯৫ (US gulf)	৩১.৭০

টীকা: বিনিময় হার: ১ ইউএস ডলার = ৬৮.৫৮ টাকা

সারণী ১.৯: ২০০৭-০৮ অর্থবছরের (১ জুলাই ২০০৭ থেকে ০৮ জানুয়ারি ২০০৮) খাদ্যশস্য আমদানি ('০০০ মেট্রিক টন)

আমদানির ধরন	চাল	গম	মোট
সরকারি আমদানি (বিডিআর সহ)	৩০৯.৬৩	১৭২.৭৬	৪৮২.৩৯
	[১৫.৬০]	[০.০০]	[১৫.৬০]
বেসরকারি আমদানি	৬৯৭.১১	৮৭১.৬৪	১৫৬৮.৭৫
	[৯৪.০৫]	[৪৫.৮৫]	[১৩৯.৯০]
মোট	**১০০৬.৭৪**	**১০৪৪.৪০**	**২০৫১.১৪**
	[১০৯.৬৫]	**[৪৫.৮৫]**	**[১৫৫.৪০]**

টীকা: বন্ধনীর মধ্যকার সংখ্যাগুলো জানুয়ারি (১৮) ২০০৮ সময়কা লের আমদানি নির্দেশ করছে

আন্তর্জাতিক বাজারে বিদ্যমান চালের দামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে চাল আমদানির জন্য কেজি প্রতি ২৮.০৯ টাকা থেকে ৩০.৮৩ টাকা ব্যয় করতে হবে (সারণী ১.৮)। ভারত থেকে চাল আমদানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য টন প্রতি ৫০০ ডলার হিসেবে আমদানির খরচ দাঁড়াবে কেজি প্রতি ৩৫.৫৬ টাকা। কিন্তু ভারত সরকার যদি বাংলাদেশ সরকারের কাছে দিল্লীর বর্তমান (০৭ জানুয়ারি ২০০৮) পাইকারি বাজার মূল্যে (টন প্রতি ১৪,১৫০ রুপি বা ৩৬০ ডলার) চাল রপ্তানি করতে রাজি হয়, তবে তার খরচ পড়বে কেজি প্রতি ২৫.৮৪ টাকা। এ কারণে সরকারকে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারত থেকে বর্তমান বাজার দরে ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির জন্য বাড়তি প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জানুয়ারি ২০০৮এ খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক চিত্র লক্ষ্য করা গেছে (সারণী ১.৯)। ডিসেম্বরের শেষে এবং জানুয়ারির শুরুতে ক্রমাগত চালের মূল্য বৃদ্ধির সাথে একরকম পাল্লা দিয়েই আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৪ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিপূর্বে সিপিডি সংকোচনশীল মুদ্রা নীতির সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রসারণমূলক মুদ্রা নীতি অবলম্বন করা দরকার। তাছাড়া দেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা অতীব প্রয়োজনীয়।

৩.৫ সার বিতরণ ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি

বর্তমানে সারের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে বিশেষত ফসফেট ও পটাশ সারের ক্ষেত্রে। জরুরি ভিত্তিতে ফসফেট (টিএসপি) ও পটাশ (এমওপি) সারের যোগান নিশ্চিত করার দরকার, কেননা ফসফেট ও পটাশ সার ব্যবহৃত হয় চারা লাগানোর আগে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সকল জমিতে বোরো ধানের চারা লাগানো হয়ে থাকে। তাই দেরি করার কোন সুযোগ নেই। ইউরিয়া সারের সমস্যা যেন আবার না দেখা দেয়, সেজন্যও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৬ বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত কৃষি পুনর্বাসন

আগস্ট মাসে পরপর দু'টি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে কৃষক ও কৃষি খাতে একটি বড় প্রভাব পড়েছে। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচির অধীনে সরকার আমন ও বোরো মৌসুমে প্রান্তিক কৃষকদেরকে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষি অধিদপ্তর বন্যা দুর্গত এলাকায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের পরিকল্পনা করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় বোরো ধান আবাদের জন্য ৩৭,৩০০ হেক্টর, গম আবাদ ১৬,০০০ হেক্টর, ভুট্টা আবাদি ৮,৮০০ হেক্টর, ডাল আবাদি ৭,০০০ হেক্টর, সরিষা আবাদি ৯,০০০ হেক্টর ও সবজি আবাদি ৬,৫০০ হেক্টর জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্গত এলাকার কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে ও দরিদ্র কৃষকের ভোগান্তি দূর করতে সরকারি সম্পদের এ বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ এর বন্যা ছিল সীমিত স্থানব্যাপী। কিন্তু দুর্গত এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। এ কারণে পুনর্বাসন কর্মসূচি সফল করতে হলে দুর্গত ইউনিয়নের (সম্ভব হলে গ্রাম পর্যায়ে) সকল কৃষক পরিবারকে এর আওতায় আনতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে সরকার দুই ব্যাগ করে ইউরিয়া, এক ব্যাগ ফসফেট ও পটাশ, ১০ কেজি উচ্চফলনশীল ধান ও উচ্চফলনশীল ভুট্টার বীজ দিতে পারে। বন্যা দুর্গত এলাকায় দুই বিঘা জমিতে দু'টি লাভজনক শস্য আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সার ও বীজ বিতরণই যথেষ্ট। এটা কার্যকরভাবে প্রান্তিক চাষি এবং সেই সাথে বড় জমির

সত্ত্বাধিকারীকেও সাহায্য করবে। সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনের জন্য দরকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, যেমন– গুণগত মানসম্পন্ন বীজ এবং ভূমি, সেচ সুবিধা, সময়মত সারের প্রাপ্যতা ও কৃষি ঋণ।

গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বন্যা ও সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের যথেষ্ট অভাব আছে। গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রবাহ ত্বরান্বিত করতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে সম্পৃক্ত করে সরকারকে একটি সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের পরপরই সাপ্তাহিক কিস্তি সংগ্রহ করার প্রচলিত নিয়ম থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি ঋণ পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে হলে একটি উপযুক্ত বিতরণ ও আহরণ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সিপিডি-ব্র্যাক'এর সম্মিলিত টিমের সাথে আলোচনায় কৃষকরা বলেছিল, প্রতি একর জমি চাষের জন্য আলুর ক্ষেত্রে ৪৫ হাজার টাকা, ভুট্টার জন্য ৭ হাজার ৫শত টাকা এবং সেচ কার্যের খরচের ওপর নির্ভর করে ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা প্রয়োজন। মাছ চাষিদের জন্যও ঋণের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। এক বিঘা পুকুরে মাছ চাষের জন্য তাদের প্রয়োজন ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। মাছ চাষিরা জানিয়েছিল তাদের পক্ষে চার থেকে ছয় মাস বিরতির পর মাসিক কিস্তিতে দুই বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব।

৩.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

২০০৯০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে দৈনিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫৫২ মেগাওয়াট। অথচ দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৫২০০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম সত্ত্বেও দৈনিক বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬৪৮ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং উৎপাদন পরিস্থিতির কারণে বোরো মৌসুমে বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে। বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সিস্টেম লস কমানোর জন্য বর্তমান সরকার এই পর্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে, তা অত্যন্ত সীমিত। ২০০৯০৮ অর্থবছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কেবলমাত্র ১৯ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার ঘাটতি মোকাবেলার জন্য নতুন প্ল্যান্টের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সরকার কর্তৃক গৃহীত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি ও টাস্কফোর্স বাড়ানো দরকার। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সরকারি খাতের বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারের জন্য উপযোগী কৌশলসম্বলিত নীতি প্রয়োজন।

৩.৮ ভর্তুকি

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্যের কারণে বর্তমান অর্থবছরে গত বছরের সমপরিমাণ জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ ৬৫০৭০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে জ্বালানি তেলের দামের ক্ষেত্রে যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল, সে দামের হিসেবেই রাষ্ট্রকে বর্তমানে উক্ত পরিমাণ অর্থ জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি দিতে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এখনই জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক হবে না। বিরাজমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু সময়ের জন্য হলেও বিপিসি (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন) কে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোন এক সময় জ্বালানি তেলের মূল্য সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

৪. উপসংহার

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথম ছয়মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা: একটি রিপোর্ট কার্ড

আশাব্যঞ্জক দিক	উদ্বেগজনক দিক
১. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম, যার মধ্যে রয়েছে– রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নতুন আইন প্রণয়ন– যেমন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৭, কয়লানীতি, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ।	১. উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিশেষত খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করতে পারে।
২. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় সাফল্য।	২. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাসের ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব।
৩. রাজস্ব আয় বিশেষত আয়করের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি।	৩. উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ জনিত ক্ষতির কারণে জনগণের প্রকৃত আয় হ্রাস।
৪. বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ অন্য সময়ের চেয়ে বেশি থাকার কারণে আগামী মাসগুলোতে অধিক আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সংকট হবে না।	৪. শিল্প খাতে স্বল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন।
৫. প্রবাসীদের প্রেরিত আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রবাহ ঘটেছে। ২০০৭০৮ অর্থবছরে ৭ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স আয়ের সম্ভাবনা।	৫. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্লথ গতি।
৬. চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি।	৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্লথ গতি উন্নয়নের ধারাকে মন্থর করছে।
৭. মূলধন বাজারে গতিশীলতা বৃদ্ধি।	৭. রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি আশাপ্রদ নয়।
	৮. স্বল্প হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা বিবেচনা করলে বর্তমান অর্থবছরের পরবর্তী ছয় মাস বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিশ্ব বাজারে ক্রমবর্ধমান উদারীকরণ এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের একত্রীকরণের কারণে বাংলাদেশকে এই সময়ে মোকাবেলা করতে হবে অভ্যন্তরীণ বাজারে উচ্চ দাম, আমদানি খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, রপ্তানি ক্ষেত্রে শ্লথ গতি, বিনিয়োগ ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা এবং বৈদেশিক লেনদেন ও বাণিজ্য ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চাপ। ২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। ২০০৮ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার যাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ২০০৯ সালে আরো অগ্রগতি সাধন করতে পারে তার জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত ইলেকশন প্লাস (Election Plus) এজেন্ডা বাস্তবায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

১০ জানুয়ারি ২০০৮

২

২০০৭০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের বিশ্লেষণ

২০০৭ সালের ৭ জুন তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ২০০৭০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এবং ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করেন। পূর্ববর্তী সরকারসমূহ কর্তৃক প্রণীত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ২০০৭০৮ অর্থবছরের জন্য বর্তমান বিশ্লেষণটি প্রস্তুত করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যউপা ত্ত বর্তমান বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক প্রণীত এই বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মন্তব্য এবং বিশ্লেষণের পাশাপাশি সিপিডির কতিপয় সুপারিশ এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১. বাজেটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

এবারই প্রথমবারের মতো একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুরো অর্থবছরের বাজেট দিয়েছে। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং চাপ থেকে মুক্ত থেকে বাজেট তৈরির সুযোগ এবারের বাজেটের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কোন কোন পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্তমান বাজেটের আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ৮৩ অনুচ্ছেদ এবং ৯৩ অনুচ্ছেদের সুত্র ধরে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোন বাধা নেই।

সামগ্রিকভাবে এ বাজেটে সংস্কার কার্যক্রমগুলো চালু রাখাসহ অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত বৈষম্যের বিষয়টিকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বর্তমান বাজেটে। বাজেটের হিসেব পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বাড়ানোর একটি উদ্যোগও লক্ষ্য করা গেছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পাশাপাশি পরবর্তী তিনটি অর্থবছরের (২০০৭০৮ থেকে ২০০৯১০) জন্য একটি নতুন মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদের জন্য হলেও 'পরিকল্পনাহীন শূণ্যস্থান' সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কিছুটা অবসান ঘটাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পিআরএসপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৭০৮ অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এই হার অর্জন করতে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে অগ্রগতির প্রয়োজন হবে তা মূলত বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, প্রস্তাবিত সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে আগামী অর্থবছরের ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে, কিন্তু বাজেট প্রস্তাবনায় তার প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। নিম্ন রাজস্ব প্রত্যাশার বিপরীতে উচ্চ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে উদ্ভূত ভঙ্গুর আর্থিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই এবারের বাজেটে কিছু চিন্তাশীল আর্থিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ২০০৭০৮ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরগুলোর চাইতে আলাদাভাবে বাজেট তৈরির একটি চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রকৃত অর্থে তা সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারেনি।

২. সরকারি আর্থিক কাঠামো

বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করলে ২০০৯০৮ অর্থবছরে বেশ কিছু দুর্বলতা পাওয়া যায় প্রস্তাবিত আর্থিক কাঠামোতে। তুলনামূলকভাবে কম রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অনেক বেশি। একই সঙ্গে সরকারি ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপির অংশ হিসেবে) এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে কম। বিপুল অংকের বাজেট ঘাটতি (জিডিপির ৫.৬ শতাংশ) অর্থায়নে সম্পদের যোগান দেওয়া সরকারের জন্য আগামী অর্থবছরে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। ফলে অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর স্পষ্টত চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এডিপির প্রায় ৪৯ শতাংশ অর্থ বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বৈদেশিক অর্থায়নের (অনুদান ও ঋণসহ) এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা এডিপি অর্থায়নকে একটি কৌশলগত সীমাবদ্ধতায় ফেলতে পারে।

২.১ রাজস্ব আয়

২০০৯০৮ অর্থবছরের জন্য ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; যা ২০০৮০৭ অর্থবছরের সংশোধিত অংকের তুলনায় ১৫.৮ শতাংশ বেশি (চিত্র ২.১)। অন্যদিকে রাজস্ব জিডিপি এবং করজিডিপি হার নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১০.৮ শতাংশ এবং ৮.৬ শতাংশ; যা ২০০৮০৭ অর্থবছরে ছিল ১০.৫ শতাংশ এবং ৮.৪ শতাংশ। যদিও ২০০৯০৮ অর্থবছরে জন্য এর চেয়ে বেশি রাজস্ব জিডিপি (১১.৬ শতাংশ) এবং করজিডিপির (৯.৬ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রা পিআরএসপিতে ছিল। গত কয়েক বছর যাবৎ রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ক্ষেত্রে (জিডিপির শতকরা হিসেবে) ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা বেশ কমই বলা যায়।

চিত্র ২.১: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে করজিডিপির হার

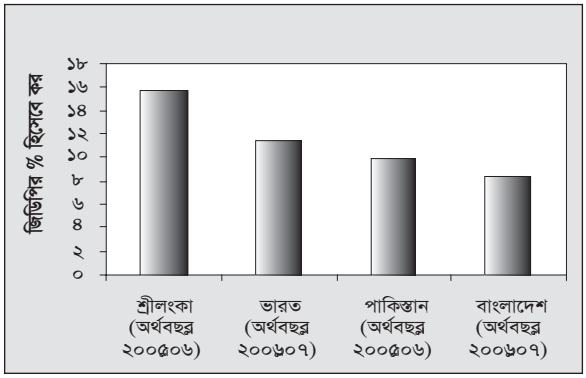

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর

২০০৯০৮ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে এনবিআরের কর আদায়ের ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে যা ২০০৮০৭ অর্থবছরে ছিল ১৫.৫ শতাংশ। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আগামী অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ে এনবিআরের অবদান ৭৬.৫ শতাংশ হতে হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে অর্জনের যে গতি তার আলোকে বলা যায় এ কাজটি অবশ্যই কষ্টসাধ্য এমনকি অসম্ভবও হতে পারে। ২০০৯০৮ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অতিরিক্ত ৭ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে ভ্যাট থেকে ২৮.২ শতাংশ, আয়কর থেকে ২৪.৪ শতাংশ এবং আমদানি

শুল্ক থেকে ১৩.৭ শতাংশ অর্জন করতে হবে (চিত্র ২.২)। সার্বিকভাবে অতিরিক্ত রাজস্বের মধ্যে রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআরের) অবদান ৮১.৪ শতাংশ হতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বহির্ভূত কর

২০০৭০৮ অর্থবছরে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর (মাদক শুল্ক, গাড়ি, ভূমি এবং স্ট্যাম্প) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১২.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৬০৭ অর্থবছরে এ খাতে ১৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর আদায়ের এ লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই রক্ষণশীল। ২০০৭০৮ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ে এনবিআরবহির্ভূত কর উপাদানের অবদান হবে ৩.৫ শতাংশ যা ২০০৬ ০৭ (সংশোধিত) অর্থবছরে ছিল ৩.৬ শতাংশ। মোট লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বর্ধিত রাজস্বের মধ্যে এ উপাদানের অবদান হবে ২.৮ শতাংশ।

করবহির্ভূত রাজস্ব

২০০৭০৮ অর্থবছরে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২.১ শতাংশ, যা মোট রাজস্বের প্রায় ২০ শতাংশ। ২০০৬০৭ অর্থবছরের সঙ্গে তুলনায় এ লক্ষ্যমাত্রা কম। ২০০৫০৬ অর্থবছরের প্রকৃত আদায়ের তুলনায় ২০০৬০৭ অর্থবছরে করবহির্ভূত রাজস্বে ১৯.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। আগের অর্থবছরের তুলনায় অতিরিক্ত রাজস্বের মধ্যে করবহির্ভূত রাজস্বের অবদান হবে ১৫.৮ শতাংশ।

চিত্র ২.২: ২০০৭০৮ অর্থবছরের রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে বর্ধিত অবদান

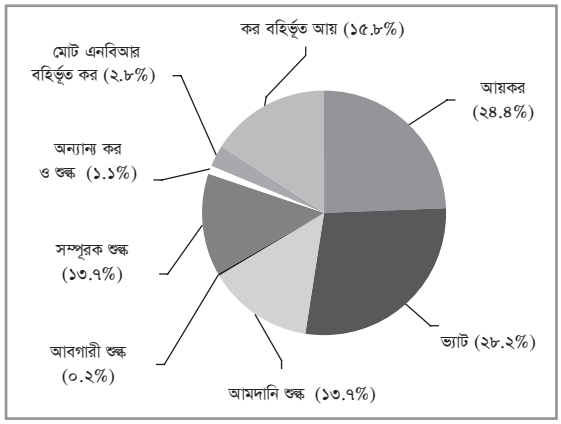

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

বিভিন্ন উপাদানে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার হিসেব ইঙ্গিত দেয় যে, অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুল্কের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় করের ওপর বেশি নির্ভরশীল। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭০৮ অর্থবছরে বর্ধিত আদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ করের অবদান বেশি হবে।

২.২ সরকারি ব্যয়

উচ্চ সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার কারণে ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আর্থিক কাঠামোতে ভঙ্গুরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মোট সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৭ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা যা ২০০৬

০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২০ হাজার ৩০১ কোটি টাকা বা ৩০.৪ শতাংশ বেশি, যেখানে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৮ শতাংশ। জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় পিআরএসপি লক্ষ্যমাত্রার ১৫.৩ শতাংশের বিপরীতে বাজেটে ধরা হয়েছে ১৬.৪ শতাংশ যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের চেয়ে ১৪.৩ শতাংশ বেশি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্বিক ব্যয়ে এডিপির অবদান কমেছে। সার্বিক ব্যয়ে এডিপি এবং অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় যথাক্রমে ৩০.৪ শতাংশ এবং ৫৫.৫ শতাংশ, যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরে ছিল ৩২.২ শতাংশ এবং ৬৩.১ শতাংশ।

মোট সরকারি ব্যয়ের খাত ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় যে, জনপ্রশাসন খাতে ২০০৯০৮ অর্থ বছরে আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে (সারণী ২.১)। এ খাতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৫৭.৭ শতাংশ। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ ১ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা (৫১.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে অতিরিক্ত ১৯১ কোটি টাকা (৩৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এডিপি বাদে মোট সরকারি ব্যয় বাড়বে ১৫ হাজার ৪০১ কোটি টাকা। বিপিসির দায় এবং জনপ্রশাসনে অতিরিক্ত বরাদ্দের ফলে ১১ হাজার ১০৪ কোটি টাকা বা ৭২.১ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

সারণী ২.১: মোট ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিতরণ

(উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

খাত	অর্থবছর ২০০৬০৭ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০০৯০৮ (বাজেট)	সংশোধিত বাজেটের (২০০৬০৭) তুলনায় পরিবর্তন	
			কোটি টাকা	%
জন প্রশাসন	৬২০১	৯৭৮২	৩৫৮১	৫৭.৭
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩০৩৪	৪৫৮৬	১৫৫২	৫১.২
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৫০৩	৬৯৪	১৯১	৩৮.০
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৯১৮	৩৮৯৩	৯৭৫	৩৩.৪
কৃষি	৫৩১৬	৬৮৯১	১৫৭৫	২৯.৬
গৃহায়ন	৫৮১	৭৩১	১৫০	২৫.৮
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৭৫৭	৯৩৮	১৮১	২৩.৯
সুদ	৯১৫৪	১০৭৮৫	১৬৩১	১৭.৮
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৫৯৫৩	৭০০০	১০৪৭	১৭.৬
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১০৮৯৯	১২৩৬৯	১৪৭০	১৩.৫
স্বাস্থ্য	৪৯৫৭	৫৪৭০	৫১৩	১০.৩
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪৩৭৩	৪৭৫৪	৩৮১	৮.৭
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৩৪২	৭৪৭২	১৩০	১.৮
প্রতিরক্ষা খাত	৫৩৯৭	৫৪৬৯	৭২	১.৩
মোট ব্যয়	**৬৭৩৮৫**	**৮০৮৩৪**	**১৩৪৪৯**	**২০.০**

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটাবেইজ।

রাজস্ব ব্যয়

২০০৯০৮ অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৯ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত অংকের তুলনায় ৬ হাজার ৬২২ কোটি টাকা বা ১৫.৩ শতাংশ বেশি। জিডিপির অংশ হিসেবে রাজস্ব ব্যয় দাঁড়াবে ৯.৪ শতাংশ যা পিআরএসপি লক্ষ্যমাত্রার (৮.৬ শতাংশ) চেয়ে বেশি। রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বড় তিনটি খাত– বেতন ও ভাতা, ভর্তুকি ও স্থানান্তর এবং সুদ পরিশোধে ব্যয় হবে মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৮২.২ শতাংশ (চিত্র ২.৩)। এ তিনটি খাতে ব্যয় বাড়বে যথাক্রমে ৪.৯, ১৬.৭ এবং ১৭.৮ শতাংশ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ থোক বরাদ্দ (১৩২.৫

শতাংশ) বাড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধজনিত দায় ঊর্ধ্বমূখী। ২০০৬০৭ অর্থবছরে (সংশোধিত) রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধজনিত দায় ছিল ১৮.২ শতাংশ যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরে ১৯ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.৩: রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত

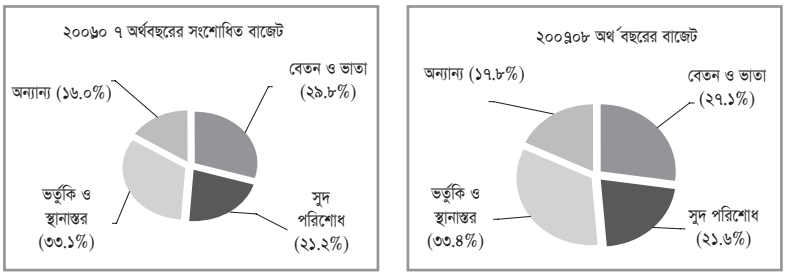

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৭০৮ অর্থ বছরের নতুন এডিপি ধরা হয়েছে ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা আগের অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির চেয়ে ২২.৭ শতাংশ এবং মূল এডিপির চেয়ে ১.৯ শতাংশ বেশি (চিত্র ২.৪)। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের এডিপিতে ৩৮টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ৯২৭টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এডিপি অর্থায়নে স্থানীয় বৈদেশিক উৎসের অনুপাতে ২০০৬০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপির মতো একই রকম (৬৩ ঃ ৪৭) লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে এডিপির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৫ শতাংশে দাঁড়াবে, যা ১৯৯১ সালের পর থেকে এ যাবৎকালে সর্বনিম্ন।

চিত্র ২.৪: জিডিপির শতাংশ হিসেবে এডিপি

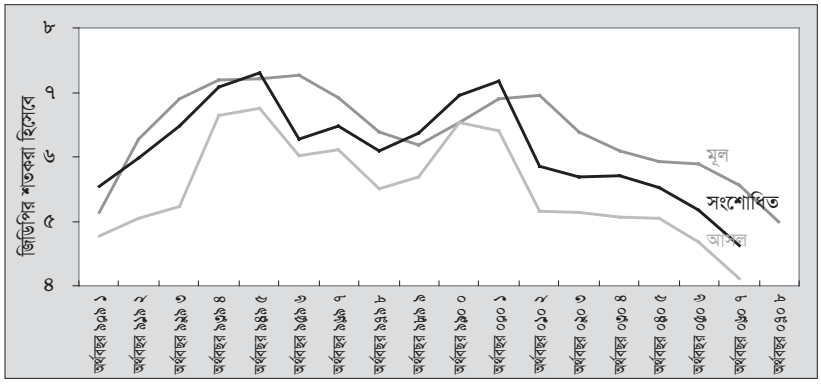

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

রাজনৈতিক চাপ মুক্ত থাকার ফলে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়নে আকারের তুলনায় গুণগত মানকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। নতুন এডিপির খাত ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায়, শিক্ষা এবং ধর্ম খাত সর্বোচ্চ (১৬.৩ শতাংশ) বরাদ্দ পেয়েছে, যদিও তা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের মূল এডিপির চেয়ে ২.৯ শতাংশ কম। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের এডিপিতে বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সংশোধিত এডিপির (২০০৬০৭) তুলনায় এ খা তে বরাদ্দ বেড়েছে ৩০.৭ শতাংশ, যা ২০০৬০৭

অর্থবছরের মূল এডিপির চেয়ে ১৪.৯ শতাংশ বেশি। কৃষি খাত সংশোধিত এডিপির (২০০৬০৭) চেয়ে ২২.৬ শতাংশ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে তবে তা মূল এডিপির চেয়ে ১৪.৬ শতাংশ কম। সমাজ কল্যাণ, নারী ও যুব উন্নয়ন খাতে সংশোধিত এডিপির চেয়ে ৭.৭ শতাংশ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হলেও তা মূল এডিপির অর্ধেকেরও (কমেছে ৫৫ শতাংশ) কম।

২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি এবং ২০০৭০৮ অর্থবছরের এডিপির ধরন বিশ্লেষণের পর পূর্ববর্তী অর্থবছরের আর্থিক বোঝা পরবর্তী অর্থবছরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। খাতভিত্তিক বরাদ্দ কাঠামো বিশেষত পানি সম্পদ, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ, পরিবহণ এবং শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ২০০৬০৭ অর্থবছরের মূল ও সংশোধিত এডিপির যে পার্থক্য, তা ২০০৭০৮ অর্থবছরের এবং ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের পার্থক্যের কাছাকাছি (সারণী ২.২)।

সারণী ২.২: নির্দিষ্ট খাতে এডিপির বরাদ্দ পরিবর্তন

এডিপির খাত	পরিবর্তন (কোটি টাকায়)	
	২০০৭০৮এর মূল এডিপি ২০০৬ ০৭এর সং শোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	২০০৬০৭এর সং শোধিত এডিপি ২০০৬০৭এর মূল এডিপি তে বরাদ্দ
পানি সম্পদ	২৬৯.২১	৲২৬৯.৯৭
পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ	৫৮৫.২১	৲৫৮০.২
যোগাযোগ	৩১৩.৫৯	৲৩১৮.৬১
সড়ক যোগাযোগ	২৪২৮.১৫	৲২৪১১.৯৮
বিমান, রেল এবং নৌ যোগাযোগ	৮৭৫.৫৯	৲৮৯৬.৭৮
শিক্ষা ও ধর্ম	৮২৪.৪৮	৲৯৩৫.১৮

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটাবেইজ।

থোক বরাদ্দ

২০০৭০৮ অর্থবছরে এডিপিতে কোন খাতভিত্তিক থোক বরাদ্দ নেই। মোট থোক বরাদ্দ ২০০৬০৭ অর্থবছরের মূল এডিপির তুলনায় ৬৫.৮ শতাংশ কম। অন্যদিকে ২০০৭০৮ অর্থবছরের এডিপিতে অননুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে। বিশেষ থোক বরাদ্দ এবং অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের জন্য যথাক্রমে ১ হাজার ৪১৩ কোটি ৯৮ লাখ এবং ৯ শত ৯২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ দুটি খাতের যৌথ বরাদ্দ মোট এডিপির ৯.১ শতাংশ।

শিক্ষা ও ধর্ম

মূল বরাদ্দ থেকে ২৪.২ শতাংশ কমিয়ে ২০০৬০৭ অর্থবছরের এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতের বরাদ্দ সংশোধন করা হয়েছে। তবে এককভাবে ধর্ম বিষয়ক প্রকল্পগুলোতে মূল এডিপির চেয়ে ২৮.২ শতাংশ বেশি খরচ করা হয়েছে। একইভাবে ২০০৭০৮ অর্থবছরের এডিপিতে যেখানে শিক্ষা ও ধর্ম মিলে ২০০৬০৭ অর্থবছরের মূল এডিপির চেয়ে ২.৯ শতাংশ কম বরাদ্দ পেয়েছে, সেখানে ধর্ম সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো আলাদাভাবে ৪৭.৯ শতাংশ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। ধর্ম সম্পর্কিত খাত অবমূল্যায়িত হতে পারে এই ধারণা থেকে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে অননুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ১৮৭ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও ধর্ম একই খাতের আওতায় রাখা নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে এবং এ ধরণের প্রবণতা বরাদ্দ কাঠামোর স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

প্রতিরক্ষা

গত ৫ বছরের প্রবণতা অনুসরণ করে দেখা যায়, ২০০৬০৭ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সংশোধিত অনুন্নয়ন বরাদ্দ মূল বাজেটের চেয়ে বেড়েছে। ২০০৬০৭ অর্থবছরে এ খাতে এই পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ৫৩৬ কোটি টাকা, যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০০৭০৮ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা সেবায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় দাঁড়াবে ৫ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.৩ শতাংশ (২০০৬০৭ অর্থবছরে ছিল ৭ শতাংশ)। প্রতিরক্ষা খাতে মোট অনুন্নয়ন বাজেটের ৯.৮ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১১.৩ শতাংশ এবং একই অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ০.০২ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা খাতে উন্নয়ন বাজেটে ব্যয় বাড়বে ৬১.৩ শতাংশ।

২০০৬০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দাঁড়িয়েছে জিডিপির ১.১৫ শতাংশ। এটি উল্লেখ করা সমীচিন হবে যে, এই ব্যয় একই বছরে পাকিস্তান (২.৮৪ শতাংশ) এবং ভারতের (১.৮১ শতাংশ) চেয়ে কম।

নির্বাচন কমিশন

২০০৭০৮ অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের জন্য মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৬ কোটি টাকা। ২০০৬০৭ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১২০ কোটি টাকা। ভোটার তালিকা তৈরি সহ সামনে নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কাজে অর্থায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনকে এই অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

২.৩ বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়ন

বড় ধরনের বাজেট ঘাটতি হচ্ছে ২০০৭০৮ অর্থবছরে বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাজেট ঘাটতি (অনুদান ছাড়া) ধরা হয়েছে ২৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা যা জিডিপির ৫.৬ শতাংশ (সারণী ২.৩)। ২০০৭০৮ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির জন্য পিআরএসপি লক্ষ্যমাত্রা অনেক কম (জিডিপির ৩.৭

সারণী ২.৩: ২০০৭০৮ অর্থবছরের আর্থিক কাঠামো

বাজেটের আয়ব্যয়	২০০৬০৭ এর সংশোধিত বাজেট		২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেট	
	কোটি টাকা	জিডিপির শতকরা হিসেবে	কোটি টাকা	জিডিপির শতকরা হিসেবে
রাজস্ব আয়	৪৯৪৭২	১০.৬	৫৭৩০১	১০.৮
মোট খরচ	৬৬৮৩৬	১৪.৩	৮৭১৩৭	১৬.৪
এডিপি বহির্ভূত খরচ	৪৫২৩৬	৯.৭	৬০৬৩৭	১১.৪
সরকারের দায় (বিপিসি)			৭৫২৩	১.৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১৬০০	৪.৬	২৬৫০০	৫.০
মোট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১৭৩৬৪	৩.৭	২৯৮৩৬	৫.৬
অর্থায়ন				
অভ্যন্তরীণ উৎস	১০০৩১	২.১	১৯২৭৬	৩.৬
ব্যাংকিং ব্যবস্থা	৬৫৩১	১.৪	৭২৫৩	১.৪
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস	৩৫০০	০.৭	৪৫০০	০.৮
নন্নক্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়)		০.০	৭৫২৩	১.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন	৭৩৩৩	১.৬	১০৫৬০	২.০
বৈদেশিক অনুদান	২১৫০	০.৫	৪২৫৫	০.৮

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

শতাংশ) রয়েছে। ২০০৬০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ১৭ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা ঘাটতির (জিডিপির ৩.৭ শতাংশ) তুলনায় ২০০৯০৮ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি উল্লেখযোগ্য হারে (৭১.৮ শতাংশ) বেড়েছে। তবে বিপিসির দায় হিসেবে ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতিতে যোগ হয়েছে। এমনকি বিপিসির দায় বাদ দেওয়ার পরেও বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপির ৪.২ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পূরণ করা হবে ৬৪.৬ শতাংশ (১৯,২৭৬ কোটি টাকা) (চিত্র ২.৫)। এর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ৭,২৫৩ কোটি টাকা (অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ৩৭.৬ শতাংশ) এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ৪,৫০০ কোটি টাকা (অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ২৩.৩ শতাংশ) ঘাটতি মেটাতে ব্যয় করা হবে। অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের বাকি ৩৯ শতাংশ (৭,৫২৩ কোটি টাকা) নন্নক ন্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়) থেকে আসবে।

চিত্র ২.৫: ঘাটতি অর্থায়নের উৎস

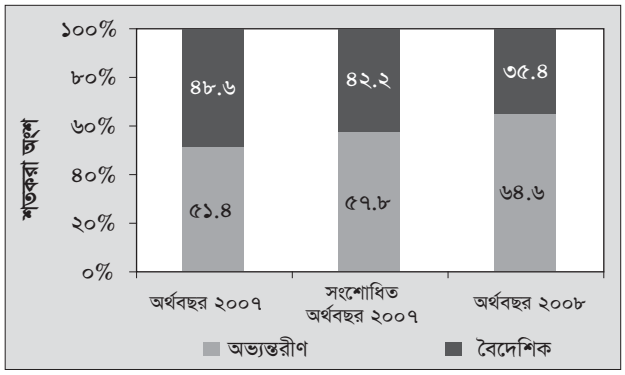

২০০৯০৮ অর্থ বছরের বিশাল বাজেট ঘাটতি মেটাতে বৈদেশিক অর্থায়নের অবদান হবে ৩৫.৪ শতাংশ (১০,৫৬০ কোটি টাকা) যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৪২.২ শতাংশ (৭,৩৩৩ কোটি টাকা)। ২০০৯০৮ অর্থ বছরে অনেক বড় অংকের বৈদেশিক অনুদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে যার পরিমাণ ৪,২৫৫ কোটি টাকা যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের (২,১৫০ কোটি টাকা) চেয়ে ৯৭.৯ শতাংশ বেশি। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ১,৫৫২ মিলিয়ন (নিট) মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য দরকার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০০৯০৮ অর্থ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা (পরিশোধ পরবর্তী) ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা হবে গত দেড় দশকের মধ্যে কোন একক বছরে সর্বোচ্চ। অতএব নতুন বাজেটের সফল বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহ করা হবে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৩. আর্থিক পদক্ষেপ

৩.১ কর এবং শুল্ক সম্পর্কিত পদক্ষেপ

প্রত্যক্ষ কর

বাজেট প্রস্তাবে ব্যক্তি আয়কর এবং কর্পোরেট করের যে কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে তা কর প্রদানে করদাতাদের অনীহা কমাতে এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতা এড়ানোর চেষ্টারই প্রতিফলন বলা যায়।

- আয়করের ক্ষেত্রে ২০০৯০৮ অর্থ বছরের বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। ব্যক্তি আয়করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৫০

হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে ন্যূনতম মাসিক করযোগ্য আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৫ শত টাকা।

- সর্বজনীন স্বনির্ধারণী প্রক্রিয়ার ওপর আইনি বিধানের প্রবর্তন স্বেচ্ছায় কর দিতে করদাতাদের উৎসাহিত করবে।
- ক্রেডিট কার্ডের ওপর উৎস কর কর্তনের বিলোপ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তাদের খরচ বাড়াবে।
- বাজারে শেয়ার না ছাড়লে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলোর ওপর ৪৫ শতাংশ হারে করারোপ হবে। এ উদ্যোগ এসব প্রতিষ্ঠানকে স্টক এক্সচেঞ্জে প্রবেশ করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পুঁজি বাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- সবধরণের রপ্তানি আয়ের উপর ০.২৫ শতাংশ হারে উৎস করারোপ চূড়ান্ত কর পরিশোধ বলে গণ্য হবে। এর ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য কর পরিশোধ সহজ হবে। তবে এর ফলে বড় বড় রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় কম হবে।
- অনাবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধার সম্প্রসারণ বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে।
- ট্রাস্ট আইনের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থাগুলোর ওপর করারোপ মূলত জ্ঞান চর্চার ওপর কর বসানো। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে এগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সরকার এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

বিশেষ কর সুবিধা

- ৬০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত করের সঙ্গে ৫ শতাংশ জরিমানা দিয়ে কর না দেওয়া বৈধ আয় স্বেচ্ছায় ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের সঙ্গে এই উদ্যোগের ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব আদায় হবে।
- অঘোষিত এবং কর না দেওয়া অর্থ দিয়ে জমি, এ্যাপার্টমেন্ট এবং মোটর গাড়ি কেনার জন্য নির্ধারিত বিশেষ কর সুবিধা স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ

ব্যক্তি কর এবং কোম্পানিগুলোর কর আদায় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জরুরিভাবে জানার জন্য এনবিআরকে সহায়তা করতে করদাতাদের একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা দরকার। কর আদায়ের সুযোগ বাড়াতে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের (এলটিইউ) কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করা উচিত।

অপ্রত্যক্ষ কর

- শুল্ক স্তরে পুনর্বিন্যাস ঘটেছে ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ, ১২ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ (অপরিবর্তিত)। একই সাথে ৪ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (আইডিএসসি) বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম দুটি স্তরে শুল্ক হার বৃদ্ধি পণ্যের আমদানি ব্যয় বাড়াতে পারে। তবে ৪ শতাংশ আইডিএসসি বিলোপ হলে এই অতিরিক্ত ব্যয় কমে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- সম্পূরক শুল্কের দুটি পৃথক স্তর ১৫ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে আত্মীকরণ শুল্ক কাঠামোকে সহজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ ও ৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ নির্ধারণ আমদানি ব্যয় কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ওপর শূন্য শুল্ক প্রত্যাহার এসকল পণ্যের আমদানি ব্যয় বাড়াবে এবং তা তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জন্য সহায়ক হবে না।

- অপরিশোধিত ভোজ্যতেল এবং ডাল জাতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কৃষকদের জন্য সার আমদানিতে শূণ্য শুল্ক অব্যাহত রাখা সরকারকে বিদ্যমান মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।
- দেশীয় আখচাষিদের রক্ষা এবং মিথ্যা ঘোষণা প্রতিরোধ করতে 'অপরিশোধিত' চিনির ওপর নির্দিষ্ট শুল্ক ২ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এটা স্থানীয় বাজারে চিনির দামের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- কিছু পদক্ষেপ, যেমন ৪ শতাংশ আইডিএসসি প্রত্যাহার, সম্পূরক শুল্ক হ্রাস এবং ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিষ্টারের ওপর আমদানি শুল্ক বিলোপের মাধ্যমে বাণিজ্য উদারীকরণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

- কর ফাঁকির জন্য নূন্যতম ও সর্বোচ্চ জরিমানা কমিয়ে যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ৭৫ শতাংশ নির্ধারণ করদাতাদের স্বনির্ধারণ (Self assessment) উৎসাহিত করতে পারে।
- বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের দ্বারা ভ্যাট নিবন্ধনের বার্ষিক নবায়ন পদ্ধতি প্রত্যাহার বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় সহজ করবে।
- ইনসুলিন, ফার্স্ট এইড বক্স, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, ছায়াবিহীন অপারেশন ল্যাম্প আমদানিতে ভ্যাট প্রত্যাহার চিকিৎসা ব্যয়, বিশেষত গরিবদের চিকিৎসা ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে।
- কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, বেসরকারি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হেলথ ক্লাবের ওপর ৪.৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের রাজস্ব আয় বাড়াবে।
- বিশেষায়িত চিকিৎসক, আইনজীবি এবং ডেন্টাল ক্লিনিকের ওপর ভ্যাট মওকুফ প্রত্যাহার ভ্যাটের আওতা বাড়াবে।
- ভবন নির্মাণ কোম্পানিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সিম কার্ড ও ইন্টারনেট সরবরাহকারী, সিনেমা হল, হেলথ ও ফিটনেস সেন্টার এবং ক্রীড়া সংগঠকদের টার্ন ওভার সুবিধার প্রত্যাহারের মাধ্যমে ভ্যাটের বিস্তৃতি আরও সম্প্রসারণের ফলে উচ্চহারে ভ্যাট আয় হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ভ্যাট নিবন্ধন অধিকতর নিবন্ধনের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
- সব ধরণের পন্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যসহ ভ্যাট পদ্ধতি আরোপের বিষয়টি এনবিআর পরীক্ষানিরী ক্ষা করে দেখতে পারে।

৩.২ কর প্রশাসনে পুনর্বিন্যাস

বাজেটে আমদানি ভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু অগ্রগতি হলেও পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে কর প্রশাসনে সংস্কার অব্যাহত রাখা দরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাজেটে কর কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা কমানো এবং বৈষম্যমূলক কর আদায় নীতিগুলো বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৩ শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন: স্থানীয় শিল্পের ওপর প্রভাব

শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং আমদানি শুল্কের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার

বিদ্যমান তিনটি স্তর যথাক্রমে ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ পরিবর্তন করে ১০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করার মাধ্যমে এবং ৪ শতাংশ আইডিএসসি প্রত্যাহার করে সার্বিক আমদানি শুল্ক কাঠামোতে পুনর্বিন্যাস করেছে। এছাড়া সরকার সম্পূরক শুল্কের দু'টি স্তরে ১৫ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ থেকে একটি স্তরে একীভূত করে ২০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অন্য সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে।

সিপিডির মতে, প্রস্তাবিত আমদানি শুল্ক স্তর স্থানীয় শিল্পের বিপক্ষে যেতে পারে। সারণী২.৪ এ দেখা যাচ্ছে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে পরিবর্তন করা হলে (সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট, অগ্রিম আয়কর এবং আরডি শূন্য, ১৫, ৩ এবং শূন্য শতাংশ থাকলে) মোট শুল্ক আরোপ ১.৭৫ শতাংশ বাড়বে। এক্ষেত্রে পুরাতন কাঠামোর ২৭.৭৫ শতাংশের পরিবর্তে নতুন কাঠামোতে শুল্ক দাঁড়াবে ২৯.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, মৌলিক কাঁচামাল এবং মূলধনী পণ্যগুলো এই গ্রুপে পড়বে। অন্যদিকে, শুল্ক হার ১২ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে পরিবর্তনের ফলে মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিকারকদের মোট শুল্ক হারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে মোট শুল্ক দায় কমবে মাত্র ০.৫৫ শতাংশ।

নতুন শুল্ক কাঠামোয় তৈরি পণ্য আমদানিকারকদের নিশ্চিতভাবে লাভবান করবে যারা এখন কম শুল্ক দায়ের মুখোমুখি হবে (৪ শতাংশ আইডিএসসি প্রত্যাহার এবং আগের মত একই ২৫ শতাংশ কাস্টম ডিউটির কারণে)। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে কাঁচামাল এবং তৈরি পণ্যের মধ্যকার শুল্ক ভারের পার্থক্য ২৩ শতাংশ থেকে কমে ১৭.২৫ শতাংশ হয়েছে (শূন্য শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধরা হলে)।

সারণী ২.৪ : প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামোর তুলনা

	সিডি	এসডি	ভ্যাট	এআইটি	আইডিএসসি	আরডি	শুল্ক দায়
আমদানি শুল্ক কাঠামো বেড়েছে ৫% থেকে ১০% এ							
পুরাতন	৫	০	১৫	৩	৪	০	২৭.৭৫%
নতুন	১০	০	১৫	৩	০	০	২৯.৫০%
আমদানি শুল্ক কাঠামো বেড়েছে ১২% থেকে ১৫% এ							
পুরাতন	১২	০	১৫	৩	৪	০	৩৫.৮০%
নতুন	১৫	০	১৫	৩	০	০	৩৫.২৫%
আমদানি শুল্ক কাঠামো ২৫% এ অপরিবর্তনীয়							
পুরাতন	২৫	০	১৫	৩	৪	০	৫০.৭৫%
নতুন	২৫	০	১৫	৩	০	০	৪৬.৭৫%
আমদানি শুল্ক কাঠামো ২৫% এ অপরিবর্তনীয়; এসডি ১৫% থেকে বেড়ে ২০% এ উন্নীত							
পুরাতন	২৫	১৫	১৫	৩	৪	০	৭২.৩১%
নতুন	২৫	২০	১৫	৩	০	০	৭৫.৫০%
আমদানি শুল্ক কাঠামো ২৫% এ অপরিবর্তনীয়; এসডি ২৫% থেকে কমে ২০% এ নির্ধারণ							
পুরাতন	২৫	২৫	১৫	৩	৪	০	৮৬.৬৯%
নতুন	২৫	২০	১৫	৩	০	০	৭৫.৫০%
আমদানি শুল্ক কাঠামো ২৫% এ অপরিবর্তনীয়; এসডি ৬৫% থেকে কমে ৬০% এ নির্ধারণ							
পুরাতন	২৫	৬৫	১৫	৩	৪	০	১৪৪.১৯%
নতুন	২৫	৬০	১৫	৩	০	০	১৩৩.০০%

উৎস : সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্পূরক শুল্ক শুধুমাত্র তৈরি পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়েছে (অন্য কথায় আগের ৫ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে এ রকম সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা হয়নি)। তৈরি পণ্যের ওপর সম্পুরক শুল্ক না থাকলে তার মোট শুল্ক ভার কমবে প্রায় ৪ শতাংশ অপরদিকে সম্পূরক শুল্ক ২৫ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনলে (বাজেটে প্রস্তাবিত) তার

মোট শুল্ক ভার কমবে ১১.১৯ শতাংশ। আবার যখন সম্পূরক শুল্ক ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশে করা হবে তখন তৈরি পণ্যের শুল্ক ভার কমবে ১১.১৯ শতাংশ। অপরদিকে সম্পূরক শুল্ক যখন ১৫ থেকে ২০ শতাংশে (বাজেটে প্রস্তাবিত) উন্নীত হবে, তখন তৈরি পণ্যের শুল্ক ভার বাড়বে ৩.১৯ শতাংশ। তাই শুল্ক কাঠামোর প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের ধরন প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তা স্থানীয় শিল্পের বিপক্ষে যেতে পারে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার শুল্ক কাঠামোকে আরও সহজ ও অধিকতর স্বচ্ছ করতে শুল্ক কাঠামোর পরিবর্তন এনেছে। রপ্তানি পণ্যের জন্য হুমকি হতে পারে এমন আমদানি পণ্যের ওপর সেফ গার্ড করারোপ সংক্রান্ত এনবিআরের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ব্যাপারে আমরা সন্দিহান। এ ধরনের করারোপ অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজ শুল্ক কাঠামোর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ নয়।

৪. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার পদক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতি প্রবণতার দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত খাদ্য মূল্যস্ফীতি খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি এবং দ্বিতীয়ত গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি শহরের চেয়ে বেশি। চলমান গড়ের ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ২০০৬ সালের এপ্রিলের ৭.০৯ শতাংশ থেকে কমে ২০০৭ সালের এপ্রিলে ৭.০২ শতাংশ হয়েছে (চিত্র ২.৬)। একই সময়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.২৮ শতাংশ। ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রথম তিনটি চতুষ্টকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ছিল এবং এ প্রবণতা এপ্রিলে অব্যাহত ছিল।

চিত্র ২.৬: জাতীয় মূল্যস্ফীতির প্রবণতা

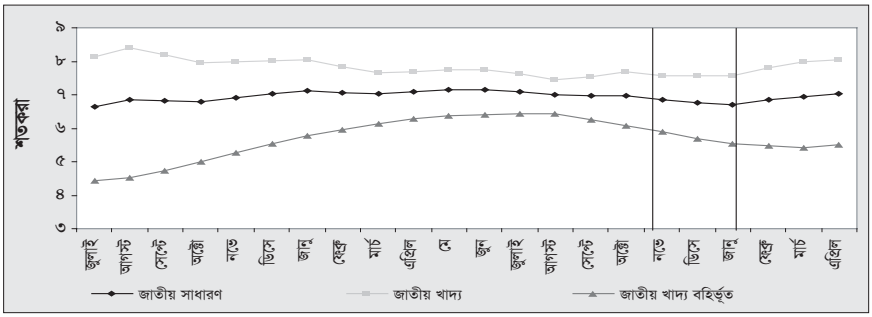

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটাবেইজ।

মূল্যস্ফীতির অন্যান্য সকল শ্রেণীকরণের চেয়ে গ্রামে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশিরভাগ সময়ে (যদিও সবভাগ সময় নয়) উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ এবং অস্থিতিশীল ছিল। ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রথম তিনটি চতুষ্টকে এবং এপ্রিলে একই রকম প্রবণতা লক্ষ্যণীয় (চিত্র ২.৭)। শুধুমাত্র ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি (চলমান গড় ৮.১ শতাংশ) গ্রামের খাদ্য মূল্যস্ফীতির (চলমান গড় ৮ শতাংশ) চেয়ে বেশি ছিল। ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রথম তিনটি চতুষ্টক জুড়ে এবং এপ্রিলে গ্রামীণ খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সুষম হারে কমেছে যেখানে শহরে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় মূল্যস্ফীতি কিছু ওঠানামা ছাড়া প্রায় স্থিতিশীল ছিল।

সিপিডির একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বর্তমান মূল্যস্ফীতি বিশেষত খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী কারণসমূহ দু'ধরনের– অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, বাজার এজেন্টদের (আমদানিকারক এবং বেপারি উভয় পর্যায়ে) একজোট হওয়া/চুক্তি, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে তথ্যের সাযুজ্য, অনেক বেশি বাজার মধ্যস্বত্বভোগী, দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের কারণে

চিত্র ২.৭: খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা (জুলাই-এপ্রিল)

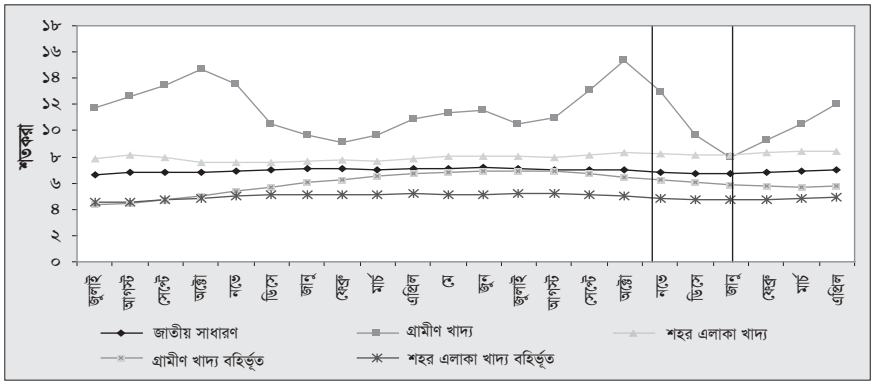

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

বাজার কাঠামোর স্থানচ্যুতি, পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যবস্মাবাণি জ্যের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়া, উচ্চ সুদের হার ও চার্জ, প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি কৌশলের অভাব এবং বর্তমান মূল্যস্ফীতি প্রবণতা থেকে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা। আন্তর্জাতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বড় বড় রপ্তানিকারক অঞ্চলে খারাপ আবহাওয়াজনিত অবস্থার ফলে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ সংকট এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম বৃদ্ধি।

বর্তমান মূল্যস্ফীতি প্রবণতার প্রকৃতি এবং কারণ অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলো আসতে পারে। প্রধানত তুলনামূলক দামে পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি একটি মূল্যবৃদ্ধি জনিত (Cost Push) মূল্যস্ফীতি যা অধিকতর সরবরাহকেন্দ্রিক ইস্যু। এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা নয় বরং পণ্যকেন্দ্রিক ইস্যু। সবশেষে বলা যায়, স্থানীয় বাজারের বর্তমান প্রবণতার ভিত্তিতে এবং আগামী কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলনের বিবেচনায় জাতীয় মূল্যস্ফীতি নিকট ভবিষ্যতে (আমন পর্যন্ত) ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসার সম্ভাবনা নেই; যেখানে ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতির প্রকৃতি এবং কারণ বিবেচনায় বলা যায়, স্বল্প মেয়াদে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার প্ররোচনা এবং মধ্যমেয়াদে উৎপাদন বাড়ানো এবং উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধিই মূল্যস্ফীতি সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে ভাল কৌশল।

সারণী ২.৫এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৬০৭ অর্থবছরের তৃতীয় চতুষ্টকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি আগের দুটি চতুষ্টকের চেয়ে কম। ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং বেসরকারি খাতে ঋণের

সারণী ২.৫: অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রবণতা
(স্থিতি)

(কোটি টাকা)

	সরকারের ঋণ	প্রবৃদ্ধি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)	অন্যান্য সরকারি	অন্যান্য সরকারি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)	বেসরকারি খাত	বেসরকারি খাত (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	মোট (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)
জানু ০৬	৩১২৬০.০০	২১.৯৫	১৫০৭৪.২০	৩৪.৭২	১৩০৯৭১.৮০	১৮.২৭	১৭৭৩০৬.০০	২০.১৬
সেপ্টে ০৬	৩৩৬৯৮.০০	২৮.৩৬	১৫২৯৬.১০	১৮.৮৬	১৩৪৮১১.৩০	১৭.৭০	১৮৩৮০৫.৪০	১৯.৬২
ডিসে ০৬	৩৬৭৭৭.২০	৩৫.৮৯	১৫৬৭৫.৯০	৩.৬১	১৪২৩৯৩.৪০	১৯.৪৪	১৯৪৮৪৬.৫০	২০.৭২
মার্চ ০৭	৩৪৮৩৯.৬০	৩১.৯৪	১৫৫৮৯.৬০	৩.০২	১৪৫৪০৫.৬০	১৬.৫৯	১৯৫৮৩৪.৮০	১৭.৭৯

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ১৪.৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় মুদ্রা খাতের প্রবৃদ্ধি সতর্কভাবে তদারকি করা উচিত।

মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমণে স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি নীতি সুপারিশমালা সিপিডির প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে (সারণী ২.৬)। বিভিন্ন পর্যায়ে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে তিনটি বড় গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন– বাজারভিত্তিক হস্তক্ষেপ, বাজারবহির্ভূত হস্তক্ষেপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এসব হস্তক্ষেপের ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল নিম্নের চারটি বিষয়ের যেকোন একটি হতে পারে।

ক. আমদানি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বাড়ানো

খ. আমদানি ও উৎপাদন ব্যয় কমানো

সারণী ২.৬: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সিপিডির সুপারিশ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাড়া

	পদক্ষেপসমূহ	হস্তক্ষেপের ধরন	প্রত্যাশিত ফলাফল
	স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপসমূহ		
১.	ঢাকা শহরে চারটি পাইকারি বাজার প্রতিষ্ঠা	বাজারভিত্তিক	প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি
২.	বিডিআরের ডাল্লভাত কর্মসূচির প্রসার	"	সরবরাহ বৃদ্ধি
৩.	সরকারি উদ্যোগে ৮ লাখ টন খাদ্যসামগ্রী আমদানি	"	সরবরাহ বৃদ্ধি
৪.	খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ক্রয় বৃদ্ধি	"	সরবরাহ বৃদ্ধি
৫.	টিআর, জিআর, এফডব্লিউপি এবং ভিজিডির মাধ্যমে ছয় লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ	"	সরবরাহ বৃদ্ধি
৬.	বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কর্মসূচি এবং হাইজেনিক পোল্ট্রি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহ প্রদান	"	উৎপাদন ঝুঁকি হ্রাস এবং সরবরাহে সহায়তা
৭.	অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার এবং চাল, গম, পেঁয়াজ, মটর ডাল এবং ছোলা ডালের শুল্ক মুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা	বাজারবহির্ভূত	আমদানি ব্যয় হ্রাস
৮.	সম্পূরক শুল্কের হার ২৫ ও ৬৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ২০ ও ৬০ শতাংশে নির্ধারণ	"	আমদানি ব্যয় হ্রাস
৯.	নতুন আমদানিকারকদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সহজ শর্তে ঋণ প্রদান	"	আমদানি ব্যয় হ্রাস
১০.	বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য প্রতি বছর ভ্যাট নিবন্ধন পদ্ধতি প্রত্যাহার	"	আমদানি ব্যয় হ্রাস
১১.	কৃষকদের জন্য সার আমদানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা	"	উৎপাদন বৃদ্ধি
	স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ		
১২.	কার্ডধারী কৃষকদের সেচ কাজে ডিজেল ব্যবহারে সরাসরি ৭৫০ কোটি টাকার ভর্তুকি	বাজারবহির্ভূত	উৎপাদন খরচ হ্রাস
১৩.	সেচ কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর ২০ শতাংশ ভর্তুকি সুবিধা অব্যাহত	"	উৎপাদন খরচ হ্রাস
১৪.	১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সার ভর্তুকি	"	উৎপাদন খরচ হ্রাস
১৫.	কৃষি ঋণ বিতরণ (৬ হাজার ৩৫১ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা)	"	উৎপাদন বৃদ্ধি
১৬.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে মাথাপিছু ভাতা ও এর আওতা বৃদ্ধি	"	সরবরাহ বৃদ্ধি এবং মূল্য সহায়তা
	মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ		
১৭.	কৃষি গবেষণায় ৩৫০ কোটি টাকার এন্ডাউমেন্ট ফান্ড	বাজারবহির্ভূত	উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস
১৮.	সড়ক ও রেলপথ মেরামত খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি	"	আমদানি ব্যয় হ্রাস
১৯.	দু'টি সার কারখানা (জিয়া এবং যমুনা সার কারখানা) সংস্কারে ৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ	"	উৎপাদন খরচ হ্রাস
২০.	নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য পরিস্থিতি পর্যবেণে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন	প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	বাজার অস্থিতিশীলতা হ্রাস
২১.	নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন	"	বাজার অস্থিতিশীলতা হ্রাস
২২.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে আইনি কাঠামো	"	বাজার অস্থিতিশীলতা হ্রাস

উৎস: দ্রব্যমূল্য নিয়ে সিপিডির গবেষণা ও বাজেট দলিল।

গ. বাজার মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা কমিয়ে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় সক্ষমতা বাড়ানো এবং বিডিআর, টিসিবি এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ওএমএসের মতো ক্ষণস্থায়ী উদ্যোগ চালু রাখা এবং উন্মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠা, এবং

ঘ. দরিদ্র শ্রেণীর জন্য মূল্য সহায়ক পদক্ষেপ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা (কাবিখা, ভিজিডি, টিআর, জিআর) বিস্তৃতি ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেওয়া।

ওপরের ২২টি উদ্যোগের মধ্যে ৬টিকে বাজারভিত্তিক হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে (৪টি সরবরাহ বাড়ানোর জন্য, ১টি বাজারের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এবং একটি উৎপাদন ঝুঁকি কমানো ও সরবরাহে সহায়তা করার জন্য), ১৩টি বাজার বহির্ভূত (৪টি আমদানি ব্যয় কমাতে, ৪টি উৎপাদন ব্যয় কমাতে, ২টি উৎপাদন বাড়াতে, ১টি উৎপাদন ব্যয় কমানোসহ উৎপাদন বাড়াতে এবং ১টি সরবরাহ বাড়াতে এবং মূল্য সহায়ক উভয়ের জন্য) এবং ৩টি বাজার ওঠানামা কমাতে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ। দেখা গেছে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উর্ধ্বগতি কমাতে সিপিডির প্রস্তাবগুলোর বেশিরভাগই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে যেকোন কিছুর আগে সরকারকে খাদ্যপ্রাপ্যতার জাতীয় স্থিতিপত্র (Balance Sheet) এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার ওপর সুনির্দিষ্ট এবং একইরকম হিসেব নিয়ে আসতে হবে। এ হিসেবের ওপর ভিত্তি করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া।

অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে; লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কৃষি খাতে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিসহ উৎপাদন ব্যয় কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া, কৃষি ঋণ সুবিধা বাড়ানো এবং ভর্তুকি সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা (সার ও উন্নত বীজ বিতরণ প্রভৃতি), শক্তিশালী বাস্তবায়নকারী এজেন্সিসহ "নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ (২০০৭)" পাশ করা, বিডিআর, টিসিবি, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা ওএমএস কার্যক্রমের বিস্তার, ব্যবস্মাবাণি জ্যে আস্থা পুনরুদ্ধার, বাধ্যতামূলকভাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) প্রদর্শন এবং বিভিন্ন আর্থিক চার্জ কমানো, মার্কিন ডলারের ক্রয় ও বিক্রয় দরের পার্থক্য কমানো এবং পরিবহণ ব্যয় কমানো। আগামী জুলাইআগ স্ট সময়কালে যেকোন ধরনের বন্যার সম্ভাবনা এবং সামনে রমজানের কথা মনে রেখে সতর্ক প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

মধ্যমেয়াদি সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে– উৎপাদকদের নিয়ে বাজারজাতকরণ সমিতি গঠনে উৎসাহ দান, আধুনিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ, পঁচনশীল পণ্যের জন্য টার্মিনাল মার্কেট এবং একটি অগ্রসর এগ্রি পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা।

৫. খাত ও অঞ্চলভিত্তিক উদ্যোগ

৫.১ কৃষি

শস্য খাত– বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সারে ভর্তুকি এবং কৃষকদের জন্য ডিজেল কার্ড

- ***সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেল ও বিদ্যুৎ ভর্তুকি:*** কার্ডধারী কৃষকদের জন্য সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলে ৭৫০ কোটি টাকা ভর্তুকির প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া অর্থ উপদেষ্টা সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ২০ শতাংশ ভর্তুকি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ২০০৭ সালের ২ এপ্রিল সরকার ডিজেলের দাম ২১ শতাংশ (প্রতি লিটার ৩৩ টাকা থেকে ৪০ টাকা) বাড়িয়েছে। সেচের জন্য প্রায় ১১ লাখ মেট্রিক টন ডিজেল ব্যবহৃত হয়। মোট সেচকৃত ৮৩ শতাংশ

জমিতে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচ করা হয় এবং বাকি জমিতে সেচ দেওয়া হয় বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে। ফলে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। সিপিডি অর্থ উপদেষ্টার কাছে দেওয়া বাজেট প্রস্তাবনায় এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

- ***সার ভর্তুকি:*** ২০০৬০৭ অর্থ বছরের বাজেটে সার ভর্তুকিতে ১১০০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ১৫৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে সার ভর্তুকি হিসেবে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- ***কৃষি গবেষণার জন্য তহবিল:*** ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে কৃষি গবেষণার জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরে ছিল ২৪৪ কোটি টাকা। কৃষি গবেষণা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটায় বাংলাদেশে কৃষি প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক ছিল প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা কৌশল। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি এবং এর ফলে একক উৎপাদন ব্যয় হ্রাস প্রধানত নির্ভর করে প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বিতরণের সাফল্যের ওপর। এ কারণে সিপিডি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং আশা করে যে, এটি প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সার্বিক ও কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হবে।
- ***প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য তহবিল:*** ২০০৬০৭ অর্থ বছরে এ খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় ২০০৭০৮ অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে এবং এ খাত উচ্চ মূল্য এবং উচ্চ ঝুঁকির উৎপাদন পদ্ধতির দিকে যাচ্ছে। *তাই এটি স্বাগত জানানোর মত পদক্ষেপ।*

  তবে এক্ষেত্রে বাস্তবায়নই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। জানা গেছে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট বরাদ্দের মাত্র ৫২.৮ শতাংশ টাকা প্রকৃত পক্ষে ব্যয় হয়েছিল; এপ্রিল পর্যন্ত ৭৭ শতাংশ এডিপি বরাদ্দ ছাড় হয়েছিল এবং ৫৬ শতাংশ খরচ হয়েছিল।

শস্য খাত – কৃষিপণ্য আমদানির ওপর শুল্ক হ্রাস স্থানীয় উৎপাদনে প্রভাব ফেলবে না

- ***শুল্ক মুক্ত সার আমদানি:*** বাজেটে কৃষকদের জন্য সার আমদানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের উচ্চমূল্য এবং চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় উৎপাদন কম বিধায় এটি একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।
- ***শুল্ক মুক্ত কৃষিপণ্য আমদানি:*** অর্থ উপদেষ্টা অপরিশোধিত ভোজ্য তেল এবং ডাল আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেছেন যে, চাল, গমসহ কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি শুল্ক ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কৃষি পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এখানে কৃষকদের ও ভোক্তাদের মধ্যে স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে চাল ও গমের দাম অনেক বেশি; অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় স্থানীয় উৎপাদন কম। ডালের ক্ষেত্রে চাহিদার মাত্র এক্তৃতীয়াংশ দেশে উৎপাদিত হয়। ভোজ্যতেলের বেশিরভাগই অপরিশোধিত হিসেবে আমদানি হয় এবং তা পরিশোধন করে বাজারজাত করা হয়। ফলে কৃষিপণ্যে আমদানি শুল্ক কমালে কৃষকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- ***সেচ পাম্পের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক:*** সকল প্রকার পাওয়ার পাম্প আমদানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা। এ পদক্ষেপ সেচ ও কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের পরামর্শ হলো, সেচ পাম্প আমদানিতে শুল্ক মুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা হোক।
- ***কৃষি ঋণ:*** বাজেটে কৃষি ঋণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৩৫১ কোটি টাকা। ২০০৬০৭ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ

বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬,৩১৬ কোটি টাকা এবং এপ্রিল পর্যন্ত প্রকৃত বিতরণ হয়েছে ৪,২৯৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। বাজেটে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক (এনসিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের (বিসিবি) মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পোল্ট্রি – বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে বিশেষ প্রকল্প এবং উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শূন্য শুল্ক

- এডিপিতে পোল্ট্রি খাতের জন্য দু'টি প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ: ২০০৭০৮ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ১৯ কোটি ৮১ লাখ টাকা (মোট বাজেট ৪ বছরে ১৫৪ কোটি টাকা); এবং (২) পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরীক্ষা প্রকল্প: ১৮ কোটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ (মোট বাজেট ৫ বছরে ৩৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা)। বাজেট বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা উল্লেখ করেছেন, 'এভিয়ান ভাইরাস আক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরি তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছাড়াও ২০ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।'
- অর্থ উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেছেন যে, জাটকা নিধন প্রতিরোধে এবং মাছের মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিশেষ নজর আছে।

  এগুলো শুভ উদ্যোগ কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাস্তবায়ন; বিশেষত বাস্তবতার আলোকে দেখা যায়, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৩৪.১ শতাংশ বরাদ্দ বাস্তবায়িত হয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পে শুল্কমুক্ত আমদানি এবং বার্ড ফ্লু (এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা) প্রতিরোধে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য সিপিডি সুপারিশ করেছিল।

৫.২ শিল্প

সরকার ২০০৭০৮ অর্থ বছরের এডিপিতে শিল্প খাতের জন্য ৩৪১ কোটি ৮ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে, যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের মূল এডিপির তুলনায় ২৫.৩ শতাংশ কম এবং সংশোধিত এডিপির তুলনায় ১৮.২ শতাংশ বেশি। পরিকল্পিত ব্যয়ের ৪২.৪ শতাংশ অর্থায়ন হবে স্থানীয় সম্পদ থেকে যেখানে ৫৭.৬ শতাংশ অর্থায়ন আসবে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে। প্রকল্পের সংখ্যা আগের অর্থবছরের ৩৯টি থেকে কমে ২৯টিতে দাঁড়িয়েছে (১৫টি বিনিয়োগ এবং ১৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) এবং নতুন কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে 'চট্টগ্রাম স্টিল মিলের সম্পদ পরিচ্ছন্ন এবং আদমজী জুট মিলকে ইপিজেডে রূপান্তর' প্রকল্পে। এর বাইরে জিয়া ও যমুনা সার কোম্পানির সংস্কারে ৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ১৯ শতাংশ। শিল্পনীতি ২০০৫এ থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও এডিপিতে কৃষিভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কোন প্রকল্প রাখা হয়নি।

৫.৩ বস্ত্র ও তৈরি পোশাক

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে ৪টি প্রকল্পে ১০ কোটি ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বড় অংশ দেবে বাংলাদেশ সরকার (প্রায় ৫১ শতাংশ) এবং বাকি ৪৯ শতাংশ অর্থায়ন আসবে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে কার্যকর সংহতির উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের বস্ত্র শিল্পের গুণগত মান এবং সামর্থ্য ও ক্ষমতা বাড়াতে তিনটি পৃথক প্রকল্পে ৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বস্ত্র খাতে ১০টি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া 'বস্ত্র খাতের উন্নয়নে NITTRAD (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডিজাইন) এবং TSMU (টেক্সটাইল স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজম্যান্ট ইউনিট)এর স ক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রকল্পে ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এমএফএ পরবর্তী চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতকে সহায়তা হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে কারিগরি সহায়তার আকারে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধার জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং তাদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়াতে আরও ২০ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ দিয়েছে। টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি আমদানিতে শূন্য শুল্ক প্রত্যাহার এবং ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এমন একটি সময়ে করা হয়েছে যখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এমএফএ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, তৈরি পোশাক খাতের অবদান অত্যন্ত উজ্জ্বল। ২০০৬০৭ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে এ খাতে ২১ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে; নিটওয়্যার খাত বিশেষভাবে ভাল করেছে। তবে উদীয়মান বাজার পরিস্থিতির বিবেচনায়, বিশেষত চীন থেকে আসা প্রতিযোগিতামূলক চাপের কারণে বর্তমানের রপ্তানি ধারা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পকে সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি পশ্চাদসংযোগ বস্ত্র শিল্পে সহায়তা দেওয়া এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে শূণ্য শুল্ক অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

৫.৪ তাঁত

আশ্চর্যজনকভাবে ২০০৯০৮ অর্থ বছরের বাজেটে তাঁত শিল্পের কোন উল্লেখ নেই। এ খাতের উন্নয়নে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি। অথচ এ খাত যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে গণ্য। প্রসঙ্গত, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তাদের ২০০৯০৮ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতের উন্নয়নে ৩২১ কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে।

৫.৫ পাট

শিল্পনীতিতে তৃতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে পাটকে চিহ্নিত করা হলেও আমরা বাজেটে তার কোন প্রতিফলন দেখিনি। স্পষ্টত বলা যায়, শুধু মাত্র থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াই যথেষ্ট নয়। পাট খাতের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

৫.৬ নিউজপ্রিন্ট

সংবাদপত্র শিল্পের সমস্যার আলোকে এবং একই সঙ্গে স্থানীয় নিউজপ্রিন্ট শিল্প উন্নয়নে নিউজপ্রিন্টের কাঁচামাল আমদানি শুল্ক মুক্ত রাখতে বাজেটে নিউজপ্রিন্ট আমদানিতে শুল্ক হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ এবং ৫০ শতাংশ স্থানীয় নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করলে যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হতো তা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাগজ শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল (pulp i.e. HS47.01-47.03) এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির (HS 84.39, 8439.91, 8439.99 and 59.11) ওপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরে ছিল যথাক্রমে শূন্য শতাংশ ও ৫ শতাংশ। এ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় কাঁচামাল (pulp i.e. HS 47.01-47.03) আমদানিতে শূন্য শুল্ক পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে। নিউজপ্রিন্ট আমদানিকারকরা ৫০ শতাংশ স্থানীয় উৎস থেকে ব্যবহার করার শর্তে বাকি ৫০ শতাংশ শুল্ক মুক্ত সুবিধা উপভোগ করার যে সুবিধা পেত, তা বাজেটে নেওয়া পদক্ষেপের মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুল্ক হার আরও কমানোর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে। অসৎ আমদানিকারকরা যাতে এ সুবিধার অপব্যবহার না করতে পারে তার জন্য সরকারকে সতর্ক হতে হবে।

৫.৭ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প: ভারী শিল্পের তুলনায় কম সুবিধা পেল

শিল্প নীতি ২০০৫এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত এবং শিল্পায়নের জন্য চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতের উন্নয়নে তেমন কিছুই করা হয়নি। এ খাতের উন্নয়নে মাত্র ৪০ কোটি ৬ লাখ টাকা (শিল্প খাতের মোট বরাদ্দের ১১.৮ শতাংশ) বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এডিপিতে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ঋণ প্রকল্পে (এসইসিপি) ২০ কোটি ৬৬ লাখ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নে আরও ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নতুন উদ্যোগ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজেটে ১০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ (এনডাউমেন্ট) তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান (বিএসসিআইসি) এসএমই ঋণ দিতে একটি থ্রাস্ট তহবিল গঠনের জন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। বর্তমান সরকারের অন্য একটি উদ্যোগ হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধনের সর্বোচ্চ সীমা ৫ লাখ টাকা থেকে ৭ লাখ টাকায় উন্নীত করা যা এসএমই খাতকে উপকৃত করবে বলে আশা করা যায়।

আমরা দেখছি যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ওপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে (আগে যা ছিল শূন্য শতাংশ) যেখানে ২০০৭০৮ অ র্থবছরে ভারত এসএমইকে উৎসাহ দিতে ক্ষুদ্র পর্যায়ের শিল্পের জন্য শুল্ক মওকুফের পরিমাণ এক কোটি রুপি থেকে বাড়িয়ে দেড় কোটি রুপি করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান সিএনজি ডিসপেনসার, চামড়া এবং জুতা শিল্পকে তাদের থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এসব খাতকে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এসএমই খাতের উন্নয়নে সিপিডির কিছু পরামর্শ :

- ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমা ৫ লাখ টাকা থেকে ৭ লাখ টাকায় পুনর্নির্ধারণের ঘোষণা পরিবর্তন করে ১০ লাখ টাকা করা যেতে পারে।
- আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল এসএমই দু'বার ভ্যাট আদায়ের কবলে পড়ে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতা সুবিধায় পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিযোগিতা বাড়াতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বিষয়টির সমাধান করা প্রয়োজন।
- বড় এসএমইগুলোর কাছ থেকে টার্ন ওভার কর আদায় করা যেতে পারে।
- এসএমই খাতে ঋণ সুবিধার অধিকতর প্রবেশের জন্য ঋণ প্রক্রিয়া সহজ হওয়া প্রয়োজন।

৫.৮ কৃষি ভিত্তিক শিল্প

কৃষি ভিত্তিক শিল্প–ইইএফ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে ঋণ সহায়তা

- বাজেটে ইক্যুইটি এন্টারপ্রিনিওরশিপ ফান্ডে (ইইএফ) ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কৃষি এবং আইসিটির জন্য ইইএফএর আওতায় এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), বেসিক ব্যাংক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষ্লিভি ত্তিক শিল্পের জন্য ঋণ সহায়তা হিসেবে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- মিথ্যা ঘোষণা এড়াতে এবং আখ চাষি ও স্থানীয় চিনি শিল্পের স্বার্থে 'অপরিশোধিত' চিনি আমদানির ওপর নির্দিষ্ট শুল্ক ২২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৪০০০ টাকা করা হয়েছে।

- গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ সিরাপের (1702.30.10, 1702.30.20, 1702.30.90 & 1702.40.00) ওপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে স্থানীয় শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ তারা আমদানি করা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। স্থানীয় শিল্প রক্ষায় এই পণ্যগুলোতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক পুনর্বহাল করা যেতে পারে।

৫.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

স্থানীয় শিল্প রক্ষার লক্ষ্যে বাজেটে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ওপর শূন্য শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ পদক্ষেপ শিক্ষা এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের পরামর্শ কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক রেখে কম্পিউটার আমদানিতে শূন্য শুল্ক বজায় রাখা হোক।

৫.১০ দুধ এবং গুঁড়ো দুধ

দুধ এবং গুঁড়ো দুধের ওপর শুল্ক ভার ৭২.৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫.৫ শতাংশ হয়েছে যেখানে অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্যের শুল্ক ভার ৫০.৭৫ শতাংশ থেকে কমে ৪৬.৭৫ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ থেকে কমে ২৮ শতাংশ হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতার বিবেচনায় এক্ষেত্রে 'নির্দিষ্ট শুল্ক' আরোপ করা যেতে পারে।

৫.১১ রপ্তানি উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ: কম অগ্রাধিকার !!

২০০৬০৭ অর্থবছরে সরকার রপ্তানি ভর্তুকি হিসেবে ১১০০ টাকা বরাদ্দ করেছে, তার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান রপ্তানি নীতিতে (২০০৬০৯) ঘোষিত ৬টি সেক্টরের মধ্যে শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং সফটওয়্যার ও আইসিটি খাতে ইইএফ্রএর মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। বাকি খাতগুলো সম্পর্কে বাজেটে আদৌ কোন উল্লেখ করা হয়নি। বাজেট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এটা দেখে মনে হবে রপ্তানি খাতকে তার উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে !!!

৫.১২ পরিবেশ

পরিবেশ- তদারকি ও দুষণ কমানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান তবে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেই

বাজেটে দূষণ সমস্যার পুনরাবৃত্তি ছাড়া পরিবেশ রক্ষায় কোন সুনির্দিষ্ট আর্থিক পদক্ষেপ নেই এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর একটি ওয়েব সাইট ও ডাটাবেইজ তৈরির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রস্তাবেও সাড়া দেওয়া হয়নি। ২০০৬০৭ অর্থবছরে উচ্চ দূষণযুক্ত শিল্প এলাকায় দুষণ প্রতিরোধে বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট (ইটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং সেজন্য ইটিপির আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এই নীতি অধিকতর কার্যকর করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা ইটিপি স্থাপন করবে না তাদের জরিমানা করার সুপারিশ করেছিল সিপিডি।

৫.১৩ পরিবহণ

২০০৯০৮ অর্থবছরের এডিপিতে পরিবহণ খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৩৩০৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, এডিপির ১২.৪৭ শতাংশ) বরাদ্দ পেয়েছে। উপখাত ভিত্তিক বিভাজন হচ্ছে– রাস্তার জন্য ২৪২৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা এবং রেলওয়ে, শিপিং ও বেসমারিক বিমান চলাচলের জন্য ৮৭৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। প্রস্তাবিত

বাজেটে রাস্তা ও রেলওয়ে মেরামতের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে যথাক্রমে ৭৬.৫ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ। বর্তমানে বিমানের দক্ষতা বাড়াতে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন চলছে এবং বিমানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কোম্পানিতে পরিণত করার কাজ শেষ করার কোন সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি।

সিএনজি চালিত ট্রাকের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে যেখানে সিএনজি চালিত বাসের সন্নিবেশ (Assembling) শিল্পের উন্নয়নে এই বাসের আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের একটি নেতিবাচক দিক হলো, বাজেটে এবং এডিপিতে বিভিন্ন খাতের সংজ্ঞা নিয়ে অসঙ্গতি রয়েছে। রাস্তা, রেল, শিপিং ও বিমান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো এডিপিতে 'পরিবহণ' খাতের আওতাভুক্ত যেখানে বাজেটে এগুলোকে 'যোগাযোগ' খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের অসঙ্গতি বিভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মংলা বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর, যমুনার ওপর দ্বিতীয় সেতু, ঢাকা এলিভেটেড হাইওয়ে এবং ঢাকাচট্টগ্রাম এক্সপ্রেস হাইওয়ের মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৫.১৪ যোগাযোগ

যোগাযোগ হচ্ছে একমাত্র খাত যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের তুলনায় কম বরাদ্দ পেয়েছে (এডিপির ৩.৩ শতাংশ)। ২০০৭০৮ অর্থবছরে এখাতে ৫৫০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেখানে ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫৬৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এ খাতের জন্য বাজেটে সংজ্ঞাজনিত দুর্বলতা রয়েছে। এ খাতের উল্লেখযোগ্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ হচ্ছে–

- জনগনের জন্য শেয়ার ছাড়লে ও পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত হলে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলোর কর্পোরেট কর ৩৫ শতাংশ হবে।
- সিম কার্ডের ওপর ৬০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকার অধিকতর রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে।
- ভিওআইপি ব্যবসাকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনার নীতি অতি শিগগিরই চূড়ান্ত হচ্ছে। যদিও কলচার্জ হিসেবে গ্রাহকদের আগের চেয়ে বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তথাপি এই উদ্যোগ সরকারের অধিকতর রাজস্ব আয় নিশ্চিত করবে।

৫.১৫ জ্বালানি

বিদ্যুৎ

সরকার আগামী ৩ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রথম বছরে ৩৪৫ মেগাওয়াট, দ্বিতীয় বছরে ৯০০ মেগাওয়াট এবং তৃতীয় বছরে ১০৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাজেটে ১১৫৫ কোটি ৬ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৪টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে ৯টি প্রকল্প জাতীয় গ্রিডে ২২৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করবে। তবে প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ এবং এসব প্রকল্প শেষ হওয়ার সময়সীমা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

অবহেলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে এ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর (আইপিপি) বকেয়া বিল

নিষ্পত্তির জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) ৩৫০ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে জ্বালানির বিকল্প উৎস ব্যবহার উৎসাহিত করতে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্টে কর অবকাশ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানের চরম বিদ্যুৎ ঘাটতির বিবেচনায় এটি একটি ভালো উদ্যোগ।

তেল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

সরকার ২০০৯০৮ অর্থ বছরের এডিপিতে তেল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ৭২৯ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। এ খাতের বরাদ্দ আগের বছরের বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দ বেড়েছে ৪০৬ শতাংশ। এটা হয়েছে মূলত 'মনোহরদীধনুয়া, এ লেঙ্গযমুনা সেতু (পূর্ব পার্শ্ব) গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন এবং আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কমপ্রেসর স্থাপন' প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য। এ প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৭৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকা যা এ খাতের মোট বরাদ্দের ৩৮.২ শতাংশ। পেট্রোলিয়াম আমদানি প্রবাহ বজায় রাখতে বিপিসিকে ৬০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকার বিপিসির পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণ (৭৫২৩ কোটি টাকা) নিজের দায় হিসেবে নিয়ে সমপরিমাণ বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বন্ড ইস্যুর প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি।

৫.১৬ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন

ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতে ১৫৯৬ কোটি ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ বেশি। সরকার আগামী তিন বছরে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ৯০ ভাগ এবং স্যানিটেশন সুবিধা ১০০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। পাশাপাশি ছিন্নমুল, বস্তিবাসী এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ঢাকার খাস জমিতে ১৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মানের কর্মসূচি অচিরেই বাস্তবায়ন করবে।

৫.১৭ বিদেশি বিনিয়োগ

প্রস্তাবিত বাজেটে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে সরকার প্রবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য কর ছাড় সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে। এই উদ্যোগ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কেননা কর ছাড় অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ করে।

৫.১৮ পুঁজি বাজার

যদিও বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ক্রমাগত বিস্তৃত ও গভীর হচ্ছে, তথাপি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ওপর অপ্রত্যক্ষ চাপ ছাড়া প্রস্তাবিত বাজেটে শেয়ার বাজার উন্নয়নের জন্য কোন আর্থিক উৎসাহ দান নেই। ২০০৯০৮ অর্থ বছরে সরকার কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও জ্বালানি খাতের) শেয়ার বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাভূক্তি পুঁজিবাজারকে অবশ্যই চাঙ্গা করবে এবং বাজারকে আরও গতিশীল করতে পারবে। তবে বাজেটে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৫.১৯ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

- ***রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন:*** বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রূপালী ব্যংকের বিক্রয় প্রক্রিয়া ২০০৭ সালের মধ্য জুন নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া

তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্পোরেটাইজেশন প্রক্রিয়া অনেকটা এগিয়েছে। যদিও জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক ইতিমধ্যে লাইসেন্স পেয়েছে তবে এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের কোন অগ্রগতি নেই।

- ***রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান:*** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের দক্ষতা বাড়াতে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মংলা উভয় বন্দরের দক্ষতা সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে ৬টি স্থলবন্দর বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের জন্য চুক্তি করেছে যাদের মধ্যে ২টি সম্পূর্ণভাবে বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ বিমানকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রুপান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত জটিলতা কমিয়ে আনতে আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই খাতের সংস্কারে বাজেটে নেওয়া পদক্ষেপ প্রশংসনীয় কিন্তু এসব উদ্যোগের কার্যকর বাস্তবায়ন হবে তত্ত্বধায়ক সরকারের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

৫.২০ স্থানীয় সরকার, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

- ***সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ:*** সরকার উত্তরাঞ্চলে (রাজশাহী বিভাগ) বিভিন্ন এডিপি প্রকল্পে ২৯৫৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ৩৪ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন এডিপি প্রকল্পে দক্ষিণাঞ্চলে (খুলনা ও বরিশাল) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৬৫২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ৪২ শতাংশ বেশি। তুলনামূলকভাবে কিছু অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এটি ভাল পদক্ষেপ। তবে এসব বরাদ্দের ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্পের সংখ্যা অথবা প্রকল্প ভিত্তিক নির্দিষ্ট বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আঞ্চলিক বরাদ্দের তুলনায় বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ দেওয়া বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে। ২০০৭০৮ অর্থবছরের এডিপিতে ৬টি প্রকল্প কেবল মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ হিসেবে (আগের থোক বরাদ্দ) পার্বত্য অঞ্চলের জন্য ১০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- ***এলজিআরডি-স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ:*** জাতীয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। চর, হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সহায়তা ১৫০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৯৮৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। পার্বত্য জেলাগুলোতে বিশেষ খাদ্য ও উন্নয়ন সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

  এগুলো শুভ উদ্যোগ। প্রকল্পগুলোতে দ্রুত অর্থ ছাড় এবং কার্যকর বাস্তবায়ন হবে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। উলেখ্য যে, ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট বরাদ্দের মাত্র ৩৫.৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৬. সামাজিক খাত এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বাজেটে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯,৭০১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন যা মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ। এর মধ্যে ১৫.২ শতাংশ শিক্ষা এবং ৬.৯ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৬.১ শিক্ষা

- বাজেটে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষা গবেষণার জন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকার অনুদান প্রস্তাব করা হয়েছে। যে কোন সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত বিজ্ঞান, জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং গাণিতিক বিজ্ঞান অনুষদকে ওই সহায়তা দেওয়া হবে যদি তারা স্বীকৃত ও সুপরিচিত জার্নালে কমপক্ষে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে, এবং এক বছরের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রস্তাবিত সহায়তা প্রদান করা হবে। এটি একটি ইতিবাচক ও উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে।
- অর্থ উপদেষ্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ লাখ ছাত্রছা ত্রীকে মাসিক ১০০ টাকা উপবৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাবও করেন। গণশিক্ষা কার্যক্রমে স্বাক্ষর যোগ্যতা অর্জনকারী ৬ লাখ ৫ হাজার জনকে ২০০৯০৮ অর্থবছরের মধ্যে অব্যাহত শিক্ষা দানের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ারও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক (যার ৬০ শতাংশ হবেন মহিলা) নিয়োগ এবং ১০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া নতুন ১৮,১৮৬ টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে।
- প্রতিটি জেলার একটি স্কুলে একটি কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলার প্রস্তাবটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত কিন্তু এই সময়ের বর্ধনশীল প্রয়োজন মেটাতে তা অপর্যাপ্ত।

৬.২ *স্বাস্থ্য খাত – ফলপ্রসূ এইচএনপিএসপি কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাব*

- বাজেটে ইনসুলিনসহ বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী ওষুধের আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বাজেটে বলা হয়েছে যে, সরকারি খাতে অধিক সংখ্যক নার্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এবং বেসরকারি হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে নার্সের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।
- হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ডাক্তারদের ফি থেকে অগ্রিম কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এনবিআর এ পদক্ষেপের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে কিনা তা এখন প্রধান বিবেচ্য।

  ২০০৬০৭ অর্থ বছরের জুলাই ফেব্রুয়ারি সময়ে বরাদ্দের মাত্র ৩৯ শতাংশ ব্যয় হয়েছে; ফলে এ খাতে বাস্তবায়নই প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (এইচএনপিএসপি) কার্যক্রম মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত স্বাধীন পর্যালোচনা টিম (আইআরটি) প্রণীত এবং ২০০৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন (এ্যানুয়েল প্রোগ্রাম রিভিউ) রিপোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইআরটির মতে, তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এইচএনপিএসপি ব্যর্থ হয়েছে। এগুলো হলো– কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট)। আইআরটির ভাষায়, 'এ মুহূর্তে এইচএনপিএসপিকে গুরুতর অসুস্থ রোগীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে যা ছাড়া এটি অন্তিম পর্যায়ের অসুস্থ রোগীতে পরিণত হবে। তাই বাস্তবায়নের দিকটিতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন হবে।'

সারণী ২.৭: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

বিদ্যমান কর্মসূচি	অর্থবছর ২০০৬ ০৭ (বাজেট)	২০০৬ ০৭ (সংশোধিত বাজেট)	অর্থবছর ২০০৭ ০৮ (বাজেট)	সংশোধিত বাজেটের(২০০৬ ০৭) তুলনায় প্রবৃদ্ধি (শতাংশে)
বয়স্ক ভাতা	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০	৪৪৮.৮০	১৬.৯০
বিধবা ও দুস্থ মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি	১৫৬.০০	১৫৬.০০	১৯৮.০০	২৬.৯০
অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা কর্মসূচি	৬০.০০	৭৮.২০	৯৯.৫০	২৭.২০
প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	৪০.০০	৪০.০০	৫২.৮০	৩২.০০
প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩৫.০০	৩.৮০
এসিডদগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য তহবিল	১০.০০	৫.০০	১০.০০	১০০.০০
গৃহহীনদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল	৫০.০০	০.০০	০.০০	ন
মৌসুমী বেকারত্ব মোচন তহবিল	৫৫.০০	০০.০০	৫০.০০	ন
স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া কর্মচারী/শ্রমিকদের পুনপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান	৩০.০০	১০.০০	০.০০	ন১০০.০০
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য উন্নয়ন তহবিল	২০.০০	০.০০	২০.০০	ন
ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর এবং জিআর	১০.৫৭	১২৩২.০০	১৬৪৯.০০	৩৩. ৮০
মোট	লাখ মেট্রিক টন	**১৬৬৯.২০**	**২২৭৩.৯০**	**৩৬.২৩**

উৎস: বাজেট বক্তৃতা ২০০৭০৮।

৬.৩ বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিশ্লেষণ – *পরিষ্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন*

প্রস্তাবিত বাজেটের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জেন্ডারসমতাকরণ ব্যয় মোট বাজেটের ২৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বাজেটে ছিল ২২ শতাংশ। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে ৩০৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে বাজেটে জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ বরাদ্দ বিধবা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যার পরিমাণ ২১৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা বা ৭০.৩ শতাংশ। নিরাপদ মাতৃত্ব ও নিরাপদ জন্মদানের জন্য 'গর্ভধারিনি দরিদ্র মাতার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা' নামে নতুন কর্মসূচিতে সরকার ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে বঞ্চিত এবং প্রান্তিক নারীরা সরাসরি উপকৃত হবে বলে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পাশাপাশি এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী নারীর কল্যাণে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ সমাজের স্বল্প আয়ের মানুষদের সহায়তা করবে। উল্লেখ্য যে, ভারতের ৫০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেন্ডার বাজেটিং সেল গঠন করেছে এবং ২০০৭০৮ অর্থবছরে শতভাগ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ৮৭৯৫ কোটি রুপি খরচ ধরা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তার জন্য 'ন্যাশনাল জেন্ডার এ্যাকশন প্লানের' আওতায় পাকিস্তান আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিতে ৪১৫ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ রেখেছে। আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রেও নারীদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নারীদের অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত ব্যয়ে আরও সহায়তা এবং এ ব্যয়ের স্বচ্ছতা বাড়ানো দরকার। এখানে অবশ্য এসব বরাদ্দের সার্বিক বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা চূড়ান্ত বিষয় বলে পরিগণিত হবে।

৬.৪ সামাজিক নিরাপত্তা – *মাথাপিছু বরাদ্দ বেড়েছে*

সামাজিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির (ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা স্কিমসহ) কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে ২০০৯০৮ অর্থবছরের বাজেটে ৩,৮৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৩৩.৪ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে বিদ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি প্রসার করতে ২,২৭৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা খরচ করা হবে যা ২০০৬০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের চেয়ে ৩৬.২৩ শতাংশ বেশি। একইসাথে ভাতা সুবিধাপ্রাপ্তের সংখ্যা ২৫ লাখ ১৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৭ লাখ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে (বৃদ্ধির হার ৯.৩ শতাংশ)। তবে বাজেটে গ্রামীণ এলাকার গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

- ***মঙ্গার জন্য তহবিল:*** ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে 'মৌসুমী বেকারত্ব মোচন তহবিল' নামে ৫৫ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছিল। ২০০৯০৮ অর্থবছরে এ তহবিলে আরও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। *তবে এই তহবিলের ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে* কেননা ২০০৬০৭ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত তহবিল এখন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়নি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের 'ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' (NREGS) থেকে শিক্ষা নিতে পারে, যার বরাদ্দ রয়েছে ১৪,৩০০ কোটি রুপি (২২,০২২ কোটি টাকা)। NREGS কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের একজন সদস্যকে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিন, বিশেষত খরা মৌসুমে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়, যেখানে তাদেরকে প্রতিদিন ন্যূনতম ৬০ রুপি (৯২ টাকা) মজুরি দেওয়া হয়। এই স্কিমের আওতায় সেচ, গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বনায়নসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ওইসব প্রকল্পগুলো পরিষ্কারভাবে ও বিধিবদ্ধভাবে NREG আইনে উল্লেখ করা রয়েছে। স্থানীয় নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষজ্ঞরা নির্দিষ্ট গ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং স্থানীয় লোকজন *গ্রাম পঞ্চায়েত* এবং *গ্রাম সভার* মাধ্যমে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্ত হন।
- ***তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল:*** তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সরকার ২৫ কোটি টাকা এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে। তবে এটি দুঃখজনক যে ২০০৬০৭ অর্থবছরের বাজেটে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থায় ভালো হবে যদি সরকার অংশগ্রহণভিত্তিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রবর্তন করে যেখানে সরকার নিজে কোম্পানির সমান অর্থ প্রদান করবে।
- ***নতুন এবং কাঙ্ক্ষিত কিছু স্কিম:*** চলমান স্কিমগুলোর সঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা বেশ কিছু নতুন ও কাঙ্ক্ষিত স্কিম ঘোষণা করেছেন। এগুলো হলো –
  - *গর্ভধারিণী দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা:* হতদরিদ্র মায়েদের নিরাপদ মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পাশাপাশি নিরাপদ জন্মদান এবং সবলভাবে শিশুর বেড়ে উঠা নিশ্চিত করতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে দরিদ্র মাতারা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন। ৩ হাজার ইউনিয়নে মোট ৪৫ হাজার মাতাকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।
  - *সরকারি সম্পদ সংরক্ষণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধা:* ৩৮৭ ইউনিয়নে ২৪ হাজার দুঃস্থ মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।
  - *বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট এবং মুক্তিযোদ্ধা পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব* করা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি।

- ঢাকায় ছিন্নমূল এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য খাস জমিতে ১৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬.৫ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটে হতদরিদ্র লোকদের সহায়তা করতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে (মঙ্গা এবং নদী ভাঙ্গন) ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭. বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে বাজেটের শক্তিমত্তা এবং কিছু অসামঞ্জস্য তুলে ধরা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটে অনেক উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব করেছে যা দেশের অর্থনীতিতে জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সম্পদ সংগ্রহ, আয় পুনর্বণ্টন এবং প্রবৃদ্ধিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাজেটীয় উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচন, জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আয় বৈষম্য নিরসনে ইতিবাচক অবদান বয়ে আনতে পারে। তবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দক্ষতার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো।

রাজস্ব বাড়ানো

- রাজস্ব সংস্কারে চলমান অবস্থান ধরে রাখা
- করদাতাবান্ধব প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুগুলোতে জোর দেওয়া
- যত দ্রুত সম্ভব সার্বজনীন স্বনির্ধারণী কর প্রদান প্রক্রিয়া চালুকরণ
- ভ্যাট নিবন্ধন সহজীকরণ

বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ

- ঝুলে থাকা প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দ্রুত ছাড় করাতে একটি টাস্কাফোর্স গঠন করা
- উন্নয়ন অর্থায়নের নতুন বাজেট সহায়তার জন্য দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করা
- বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের (BOP) স্বস্তিদায়ক বর্তমান অবস্থায় আইএমএফএর স ঙ্গে নতুন ঋণ চুক্তি করা উচিত হবে না

সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ধার

- বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের ওপর বাধা কমাতে সরকারের ব্যাংক ঋণের অস্থিতিশীলতা পরিহার করতে হবে

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

- প্রথম প্রান্তিক থেকেই দ্রুত গতিতে বাস্তবায়ন শুরু করা
- বিদ্যুৎ খাতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কৌশলগত পদক্ষেপের উন্নয়ন
- নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুণগতমানকে প্রাধান্য দেওয়া
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা জোরদার
- সরকারি বেসরকারি খাত এবং সরকারএনজিও অংশীদারি ত্বের উন্নয়ন
- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলো গতিশীল করা
- বিদ্যুৎ খাতে দৃষ্টি দেওয়া

বাস্তবায়ন তদারকি জোরদার এবং স্বচ্ছতা

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা
- বিচ্যুতি দেখা দিলে মধ্যবর্তী পর্যায়ে দ্রুত সংশোধন
- প্রধান এলাকাগুলোতে তদারকির উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব

সময় উপযোগী এবং গুণগত মানসম্পন্ন অর্থনৈতিক উপাত্তের সহজ প্রাপ্তির সুবিধা

- কর আদায় কার্যক্রমের কম্পিউটারাইজেশন
- বাজেট সম্পর্কিত নির্দেশকগুলোর নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য
- স্টেক হোল্ডাররা বাজেট সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত যাতে সহজে পেতে পারে তার জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ।

১৪ জুন ২০০৭

৩

২০০৭-০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট
সিপিডির সুপারিশমালা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষম আয় বন্টনকে অগ্রাধিকার দিয়ে *সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ* (সিপিডি) ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিস্তারিত সুপারিশমালা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য পেশ করেছিল। রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রণোদনা, রপ্তানি সহায়তা, স্থানীয় শিল্প বিকাশ, কর প্রশাসন সংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোক্তামূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিপিডি সাতটি খাতে ২৪টি বিষয়ে সর্বমোট ১১৩টি সুপারিশ করেছিল। সিপিডির সুপারিশমালা নিচে দেওয়া হলো।

১. সাধারণ আর্থিক পদক্ষেপসমূহ

১.১ ব্যক্তি আয়কর

- জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে ব্যক্তি খাতের করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা যেতে পারে।
- ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করার সময়, ক্লাবে সদস্যপদ গ্রহণ, ব্যয়বহুল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের ভর্তির প্রাক্কালে এবং একই বিষয়ের জন্য লেনদেনে কর প্রদানকারি পরিচিতি নাম্বার প্রদর্শনের একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- আয়কর অধ্যাদেশের ৮২ সি অনুচ্ছেদে উলেখিত অন্যান্য বিষয়ের মতো বেতনভুক্ত জনগণের আয়ের উৎস কর বাদ দেওয়ার পর বাকি আয়কে চুড়ান্ত আয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- করের আওতা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য করদাতার সংখ্যা চিহ্নিতকরণের প্রচারাভিযান চালানো যেতে পারে।
- বৃহৎ কর প্রদানকারী ইউনিটের উদ্দেশ্য এবং পরিধি পুনরায় বর্ধিত করা যেতে পারে।

১.২ ক্রেডিট কার্ড

- সরকার ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর পরিহার করতে পারে। কারণ অগ্রিম আয়কর ধার্য করার ফলে একদিকে যেমন কার্ডের ব্যবহার কমেছে, অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর পরিমাণও কমেছে। ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার নগদ লেনদেন কমানোর সাথে সাথে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড চালু করা যেতে পারে যেন ব্যক্তিগত ব্যয় ও কর্পোরেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়, তবে এসব কার্ডের অসৎ ব্যবহার কমাতে

কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড কেবলমাত্র যথাযথ সহযোগী ডকুমেন্ট/প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

১.৩ কালো টাকা সাদা

- কালো টাকা সাদা করার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় বিধানই বাতিল করা এবং বাড়ি-ঘর, জমি ও যানবাহনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে প্রদত্ত বিশেষ আয়করের বিধান বাতিল করা যেতে পারে।

১.৪ স্বেচ্ছায় করবহির্ভূত আয়ের ঘোষণা

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযানের প্রেক্ষাপটে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অপ্রদর্শিত বৈধ আয়ের ওপর কর প্রদানপূর্বক এ আয়কে অর্থনৈতিক মূলধারায় নিয়ে আসার সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এ স্কিমের আওতায় অপ্রদর্শিত আয়ের ওপর করদাতার জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ আয়করের হারের সাথে আরও ৫ শতাংশ জরিমানা যুক্ত করে কর প্রদানের হিসাব হালনাগাদ করা যেতে পারে। এ সুযোগ সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য করা যেতে পারে। এ আয়কর প্রদানের পর উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। অপ্রদর্শিত অর্থ ও আয়ের ওপর কর প্রদান সত্ত্বেও যদি পরবর্তীতে ঐ আয় অবৈধ হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশি-ষ্টকরদাতার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না।

১.৫ কর্পোরেট আয়কর

- ব্যাংক, বীমা কোম্পানির মতো সেবাধর্মী উচ্চহারের মুনাফালাভকারী অন্য সেবা খাত, যেমন মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ওপর ৪৫ শতাংশ হারে কর্পোরেট কর আরোপ করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত হলে এসব মোবাইল কোম্পানিকে অপেক্ষাকৃত কম হারে কর্পোরেট কর প্রদানের বিধান রাখা যেতে পারে। এর ফলে মোবাইল কোম্পানিগুলোর ওপর স্টক মার্কেটে শেয়ার বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি হবে এবং সাধারণ জনগণের জন্য এ খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।
- অবচয় ভাতার (depreciation allowance) গতি বৃদ্ধির সাথে কর অবকাশ সুবিধাদি প্রতিস্থাপিত করতে হবে। স্বল্প উন্নয়ন অঞ্চল, যেমন– পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য এ সমস্ত এলাকায় অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।
- বৃহৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হতে টার্ন ওভার কর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১.৬ আমদানি শুল্ক

- ট্যারিফ হারে স্বচ্ছতা আনার জন্য প্যারা ট্যারিফ এবং কোয়াসি ট্যারিফকে (যেমন- ৪% হারে অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ) ট্যারিফ সিডিউলে সমন্বিত করা প্রয়োজন। চলতি কার্যকর করভারের আপতন (tax incidence) যেন অপারেটিভ ট্যারিফ শিডিউলে প্রতিফলিত হয়, সেজন্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে ট্যারিফ হার সংশোধনপূর্বক বৃদ্ধি করা উচিত।
- আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইনগত বাধা অথবা মানবাধিকার সংশি-ষ্টবিষয় যুক্ত রয়েছে এমন ক্ষেত্রে অথবা বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যেখানে ট্যারিফ হার কমানো প্রয়োজন এ ধরনের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত।

- ৪-ডিজিট ট্যারিফ পর্যায়ের মধ্যে শুল্ক হারে অসমতা কমানো উচিত।
- উচ্চমূল্যের গাড়িসহ যেসব দ্রব্য সাধারণত সমাজের ধনিক শ্রেণী ব্যবহার করে সেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যেতে পারে।

১.৭ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

- বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসে ভ্যাট নিবন্ধন পদ্ধতি সরলীকরণ প্রয়োজন।
- সব ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- 'কর আরোপ করা কঠিন' এমন সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের ভ্যাট স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.৮ ভূমির মূল্য ও নিবন্ধন ফি

- সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত ভূমির নিম্ন মূল্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বৃহৎ নগরীতে (যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন) এবং আবাসিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমির জন্য এলাকাভিত্তিক উচ্চ এবং পৃথক পৃথক কর হার আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একইভাবে অন্যান্য নগরী ও উপজেলা সদরের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সাথে কর এড়ানোর প্রবণতা কমানোর জন্য এবং এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব আয়ের স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উচ্চ নিবন্ধন ফি কমানো যেতে পারে।
- বৃহৎ কৃষি জমির মালিকদের অবশ্যই কর আওতার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২. রপ্তানি প্রসার এবং আমদানি বিকল্প শিল্প

২.১ রপ্তানি প্রসার

- কোম্পানির উৎপাদন ইউনিট প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র থেকে ভিন্ন জায়গায় হতে পারে। সেক্ষেত্রে, যখন কোন কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য একই কোম্পানির প্রধান রপ্তানি কেন্দ্রে পাঠানো হয় তখন এসব লেনদেন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। সুতরাং ফ্যাক্টরি পর্যায়ে এসব পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা উচিত হবে না।
- বস্ত্র খাতের backlog এবং stocklot কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে বন্ড সময়সীমা ১৫ মাস থেকে বাড়িয়ে ২৪ মাস করা যেতে পারে।
- প্রধান রপ্তানি শিল্পে এবং সম্ভাবনাময় রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ছাড় অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- সব ধরনের রং, রাসায়নিক দ্রব্য এবং বস্ত্র খাতে ব্যবহৃত অন্যান্য কাঁচামালের ওপর ৫ শতাংশের অধিক শুল্ক হার ধার্য করা ঠিক হবে না।
- অভ্যন্তরীণ বস্ত্র খাতের পশ্চাদসংযোগ শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বিশ্ব বাজারে পোশাক খাতের প্রতিযোগি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বিদ্যমান ৫ শতাংশ নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

- পশ্চাদসংযোগ বস্ত্র শিল্প ও দেশীয় প্রচলিত পাট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উন্নয়ন ফান্ড চালু করা যেতে পারে (১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে)। এই স্কিমের আওতায় স্বল্প সুদের ঋণ শিল্পগুলোতে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার নতুন যন্ত্রপাতি বসানোর মাধ্যমে তাদের প্লান্টের আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান করবে।
- কৃষি ও প্রযুক্তি সংশি-ষ্টপ্রকল্পের বাইরেও ইক্যুইটি এন্টারপ্রিনিয়ারশিপ ফান্ড-এর আওতা বাড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য সম্ভাব্য প্রকল্প যেমন হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, মেলামাইন এবং ইলেক্ট্রনিক্স এই ফান্ডের আওতায় আনা যেতে পারে। এখাতে বরাদ্দকৃক অর্থ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা বাড়ানো যেতে পারে।

২.২ দেশীয় সংরক্ষণ নীতি এবং আমদানি বিকল্প শিল্প

- তৈরি দ্রব্যের তুলনায় যেন কাঁচামালের ওপর অধিক হারে কর আরোপ না হয় সেজন্য যৌক্তিক শুল্ক হার চালু করা প্রয়োজন।
- যন্ত্রাংশ এবং সংশি-ষ্টউপাদান আমদানির জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহের (যেমন ইলেকট্রনিক্স শিল্প তবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নয়) শুল্ক ছাড় বাড়ানো যেতে পারে।
- নিউজপ্রিন্ট আমদানির উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা উচিত। নিউজপ্রিন্ট আমদানির উপর বর্তমানে কার্যকর শুল্ক হার হচ্ছে ৪৮.৭৫ শতাংশ।
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসমূহের পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ভিটামিন এবং মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট আমদানিকে শুল্ক মুক্ত রাখা উচিত।
- পুনচার্জকৃত ল্যাম্প এবং ইউপিএস এর অভ্যন্তরীণ বাজারে অনেক চাহিদা রয়েছে তাই এসব ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য যে রক্ষণাবেক্ষণ লেড এসিড ব্যাটারি আমদানি করা হয় তা মূল্য সংযোজন করের আওতামুক্ত রাখা উচিত।
- বর্তমানে উৎপাদন পর্যায়ে টিউবওয়েল/সেচ পাম্পসমূহ মূল্য সংযোজন করের আওতামুক্ত। অপরদিকে সেচ পাম্প ও টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য পিভিসি পাইপ, ফিল্টার, হোস পাইপ, কয়েল পাইপ ইত্যাদি মূল্য সংযোজন করের আওতাধীন। এসব উপাদানও মূল্য সংযোজন করের আওতামুক্ত রাখা যেতে পারে।
- দেশজ আসবাবপত্র শিল্প বিকাশের জন্য পার্টিকেল/মেলামাইন বোর্ডের আমদানি শুল্ক কমানো যেতে পারে।
- হাসপাতালের বিছানা, মেডিকেল সার্জিকেল বা ভেটেরিনারি আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত আমদানিকৃত স্টেইনলেস স্টিলের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা যেতে পারে। মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে এস এস পাইপের ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে আনা যেতে পারে।
- সম্পূর্ণভাবে তৈরি ভোল্টেজ ষ্টেবিলাইজার আমদানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতকে ঋণ সুবিধা দেওয়া এবং বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ যোগানের লক্ষ্যে ২০০৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি স্বল্প সুদের ঋণ প্রদানের জন্য এ বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনের পরিচালন পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

- বিগত বাজেটে পোশাক শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ফান্ডে বরাদ্দকৃত অর্থ এ যাবৎ ব্যয় করা হয়নি। তাই গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য সরকার ও পোশাক শিল্পের মালিকদের সম-অর্থায়নে একটি কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ড ফান্ড চালু করা যেতে পারে। উলেখ্য কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ কর মুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।
- ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কিছু সংখ্যক প্রকল্প যেমন কৃষি ভিত্তিক শিল্প সহযোগী কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র চাষিদের সাহায্যের জন্য ফান্ড, মৌসুমী বেকারত্ব হ্রাসের জন্য ফান্ডে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহৃত হয়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্পগুলোর সঠিক নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে।
- গৃহহীনদের বাসস্থান নির্মাণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগণের আয় বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বর্তমানের ৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা উচিত।
- বিদেশে গমনকারী শ্রমিকদের ভাষা শিক্ষা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি উন্নয়ন ফান্ড গঠনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।
- মৌসুমী কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে যথাক্রমে ৫০ কোটি এবং ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে বরাদ্দকৃত এ অর্থ সম্পূর্ণ অব্যবহৃত রয়ে গেছে, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এ ফান্ড বেসরকারি সংস্থা যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আরডিআরএস, পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে মঙ্গা নিরসনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গ্রামীণ বেকারদের জন্য সরকার একটি গ্রামীণ *কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি* চালু করতে পারে। এ কর্মসূচির আওতায় মঙ্গার সময় প্রতিটি নিম্ন আয়ের পরিবারের অন্তত ১ জনের জন্য নূন্যতম ১০০ টাকা দৈনিক মজুরিতে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বিবেচনায় রেখে সর্বাগ্রে এ ধরনের কর্মসূচি বরিশাল, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের জন্য চালু করা যেতে পারে। স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ, স্থানীয় নেতা এবং গোষ্ঠী নেতাসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রতিটি গ্রামের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে পারে। স্থানীয় সরকার এনজিও অথবা সিবিও নেতাদের সাথে নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ করতে পারে।
- বিধবা ও দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা যেতে পারে।

৪ উৎপাদক এবং ভোক্তা মূল্য সহায়তা

- অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি ও আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্য বিবেচনা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু নির্বাচিত পণ্যের ওপর শূন্য শুল্ক এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। বর্তমানে শূন্য শুল্কে চাল ও গম আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আরও বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের (যেমন ডাল) ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।
- কিছু নির্বাচিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট হারে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে বিদ্যমান এ্যাড ভ্যালোরোম ট্যারিফ কাঠামোর প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত কয়েক বছরের আমদানি তথ্যের বিশেষণের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য বিদ্যমান নির্বাচিত শুল্ক

হার প্রতিস্থাপিত করে পণ্য বিশেষে পরিমাণের ওপর (প্রতি টন হিসেবে) নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আরোপের সুপারিশ করতে পারে।

- সরকার নির্ধারিত কিছু পণ্যের (গুঁড়া দুধ, অশোধিত সয়াবিন তেল এবং পাম অয়েলের ওপর বিদ্যমান শুল্ক হার ১৫ শতাংশ) ওপর থেকে উচ্চ সম্পূরক শুল্ক হার কমাতে পারে। এ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে শুল্ক অপসারনের সুবিধা যেন ভোক্তার স্বার্থ সংশি-ষ্টহয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্যাকেজিং এজেন্ট এবং এসব পণ্যের সরবরাহকারীদের সাথে আলোচনা করতে পারে। এজন্য পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নিয়ে সমঝোতা এবং স্থির দাম নির্ধারণ করা দরকার হবে।
- সবজি রপ্তানির জন্য বর্তমানে বিদ্যমান সিআইএফ মূল্যের ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা কর্মসূচিটি সরকার পুনর্নিরীক্ষণ করতে পারে। অভ্যন্তরীণ বাজারে সবজি সরবরাহ হ্রাস এবং বিদ্যমান ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য এ কর্মসূচিটি পুনর্নিরীক্ষণ করা যেতে পারে।
- যে সমস্ত কৃষক সেচের জন্য ডিজেল ব্যবহার করছে তাদেরকে সরাসরি ভর্তুকি দেওয়া প্রয়োজন। কঠোর পরিবীক্ষণ মাধ্যমে এ ভর্তুকি প্রদানের পদ্ধতিটি উন্নয়ন করা যেতে পারে, যাতে প্রকৃত কৃষকরা উপকৃত হয়। যতোদিন পর্যন্ত প্রস্তাবিত জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া না যায়, ততোদিন পর্যন্ত ডিজেল কার্ড বিতরণের মাধ্যমে ডিজেল ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে।
- যেহেতু সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা মোট বীজ চাহিদার কেবলমাত্র ১২.৫ শতাংশ সরবরাহ করছে, সেহেতু হাইব্রিড বীজ আমদানির মাধ্যমে স্বল্প দামে (ভর্তুকি দিয়ে) কৃষকদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে যা উৎপাদন খরচ কমাতে এবং উৎপাদনীশলতা বাড়াতে সহায়ক হবে।
- বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি এবং টেস্ট রিলিফ (টিআর) কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে।
- ২০০৫ সালে সর্বশেষ বেতন কাঠামো পুনঃনির্ধারণের পর মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকৃত আয় ১৫.৮ শতাংশ কমে গেছে। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য একটি অস্থায়ী ভাতা (মহার্ঘ ভাতা) চালু করা যেতে পারে, যা তিনটি স্কেলে ভিন্ন হারে দেওয়া হবে। নিম্নতম স্কেলের কর্মজীবীদের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ, মধ্যম স্কেলের কর্মজীবীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ এবং উচ্চ স্কেলের কর্মজীবীদের জন্য মূল বেতনের শতকরা ৫ ভাগ হারে এ ভাতা দেওয়া যেতে পারে।

৫. আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং খাতভিত্তিক পদক্ষেপসমূহ

৫.১ অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন

- দারিদ্র্য গতিশীলতার সাম্প্রতিক তথ্য প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ কেবলমাত্র একটি দরিদ্র দেশই নয়, যার আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে অধিক মাত্রার অসমতা। বরিশাল, রাজশাহী এবং খুলনা হচ্ছে অধিক দারিদ্র্য পীড়িত এবং কর্মসংস্থান অপ্রতুল বিভাগ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকায় বসবাসকৃত আদিবাসি সম্প্রদায়ভুক্তরাও কর্মসংস্থানের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এ অবস্থা দূরীকরণ বিদ্যমান বিশেষ সুবিধাজনক কর অবকাশ কর্মসূচি অত্যন্ত অপ্রতুল। এক্ষেত্রে সরকার এসমস্ত অঞ্চলকে বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন (যেমন: আন্তঃসংযোগ রাস্তা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ) অগ্রাধিকার দিয়ে একটি বিশেষ এবং যথেষ্ট পরিমাণ সম্বলিত সরকারি ব্যয়ের প্যাকেজ বরাদ্দের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

৫.২ কৃষি

- মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগির খামার ও ডেইরি ফার্ম এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়কর মওকুফের সময়সীমা বাড়িয়ে ২০০৮ সালের ৩০ জুনের পরিবর্তে ২০১০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত করা উচিত।
- পশু সম্পদ খাতে প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি ফিড, ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণের কাঁচামালের ওপর বিদ্যমান সকল শুল্ক ও কর মওকুফের নীতি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন ধরনের বীজ, প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পশু, মা মাছ (ব্রুড স্টক) আমদানির ক্ষেত্রে শূন্য/হ্রাসকৃত শুল্ক আরোপ করা উচিত।
- পোল্ট্রি প্রডাক্টের (যেমন-মাংস, ডিম) ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- সেচ খরচ হ্রাস করতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কাছ থেকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ বিলে শতকরা ২০ ভাগ ভর্তুকি অব্যাহত রাখা উচিত।
- গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত এবং সেচ খরচ কমাতে বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পরিধি বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করা উচিত।
- আলু, পেঁয়াজ, মসুর ডাল এবং ছোলা বীজ উচ্চ উৎপাদন সম্ভাবনাময় এলাকায় স্বল্পমূল্যে (ভর্তুকি) বিতরণ করা যেতে পারে, যা এ সমস্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- মানসম্মত বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থার যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এ কাজে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- সাম্প্রতিক অবমুক্ত ধানের জাত ও অন্যান্য শস্যের জাতসমূহ এবং পাট বীজের মূলবীজ (ব্রিডার্স সিড) উৎপাদনের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। মূল বীজ (ব্রিডার্স সিড) উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উৎপাদিত বীজ হ্রাসকৃত (ভর্তুকি) মূল্যে সরকারি-বেসরকারি বীজ কোম্পানি ও বীজ উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা আবশ্যক। এর ফলে দেশে মানসম্মত বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে ও বীজের মূল্যও কমবে।
- যেসব এলাকায় ধানে চিটা দেখা দিয়েছে, সেসব এলাকার কৃষকদের আগামী বোরো মৌসুমে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- রুই, কাতলা, তেলাপিয়া মাছের পোনা গুণগত মানে সরবরাহের সুবিধার জন্য মাছের ব্রুড স্টক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
- পোল্ট্রি খাতে মহামারির সম্ভাবনা কমানোর জন্য পোল্ট্রি বার্ডের ভ্যাকসিনেশনের জন্য সরকারের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।
- মাছ চাষ ও পোল্ট্রি উৎপাদন অঞ্চল, যেমন– গাজীপুর, নরসিংদি, ভালুকা এবং দাউদকান্দি এলাকায় অধিক সংখ্যক মৎস্য কর্মকর্তা ও পশু চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- অধিক বরাদ্দের মাধ্যমে হর্টিকালচারাল প্রডাক্টের জন্য সম্প্রসারণ ও বিপণন সেবাসমূহের শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন।

৫.৩ মূলধনী বাজার

- ট্যাক্স ফাইল পদ্ধতির সহজীকরণ যেমন– ডিভিডেন্ড আয়ের উৎসে ১০ শতাংশ কর আরোপ করে এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা (একইভাবে ব্যাংক আমানত থেকে প্রাপ্ত আয়ও একই করের আওতায় আনা)।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে বিবেচনার জন্য জনগণের শেয়ারের সংখ্যা নামিয়ে একটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমা নির্ধারণ (যেমন– প্রি-আইপিও, প্রাতিষ্ঠানিক অপসারণ, যৌথ ফান্ডের জন্য কোটা এসব ব্যতীত ২৫ শতাংশ)
- বর্তমান তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ, যার মধ্যে তাদের শেয়ারের অন্তত ২৫ শতাংশ (অথবা অধিক) জনগণের জন্য নামিয়ে আনা যেতে পারে।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যার একটি সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- জনগণের স্বার্থে একটি কোম্পানি তার আইপিও-র ওপর প্রিমিয়াম আদায় এবং ভালো শেয়ার ইস্যু করার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- শেয়ার বাজারে ভালো শেয়ারের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে সরকারি মালিকানাধীন লাভজনক শিল্প উদ্যোগসমূহের শেয়ারের মুনাফা পরিত্যাগ (divest) করা।

৫.৪ রিয়েল এস্টেট

- রিয়েল এস্টেটের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট ভ্যাট কাঠামো প্রবর্তন করা যেতে পারে; যেমন– ক) উপশহর এলাকায় স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্ন কর বা ভ্যাট খ) ১৬০০ বর্গফুটের কম আয়তনের এপার্টমেন্টের জন্য মধ্যম কর বা ভ্যাট এবং গ) ১৬০০ বর্গফুট এবং এর অধিক আয়তনের বিলাসবহুল এপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে উচ্চ কর বা ভ্যাট আরোপ করা যেতে পারে।
- একটি সেকেন্ডারি হাউজিং মার্কেট চালু করার ক্ষেত্রে পুরাতন বাড়ি হস্তান্তরের সময় নিম্ন নিবন্ধন ফি চার্জ করা যেতে পারে (একটি নতুন এপার্টমেন্টের জন্য ৫০ শতাংশ কর আদায় করা হয়)।

৫.৫ টেলিকমিউনিকেশন

- টেলিকম শিল্পের সম্প্রসারণে এবং বাজারে প্রতিযোগী ফার্মগুলোর প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জনের কারণে সকল নিবন্ধিত মোবাইল কোম্পানিকে ২০০৭ সালের মধ্যে শেয়ার বাজারে একটি নির্দিষ্ট হারে (যেমন, ২৫ শতাংশ) প্রাথমিক শেয়ার ছাড়ার জন্য বলা যেতে পারে। এই ফার্মসমূহ আর্থিক সংস্থানের উৎসকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মূলধনী বাজারে প্রবেশ করতে পারে। পাশাপাশি যতোদিন এসব কোম্পানিগুলোকে স্টক মার্কেটে অন্তর্ভূক্ত করা না হয়, ততোদিন পর্যন্ত ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর মতো তাদের কাছ থেকে একই হারে কর্পোরেট কর আদায় করা যেতে পারে।

৫.৬ বিদ্যুৎ

- বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পাস্ট স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৫.৭ পোশাক শিল্প

- পোশাক শিল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং বিদেশের বাজারে প্রবেশের সুবিধা পেতে কারিগরি উন্নয়ন ফান্ড গঠন করা যেতে পারে, যা বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

- বিভিন্ন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা এলাকায় আর্থিক সহায়তা এবং বিশেষ সেবা সুবিধাদি প্রদানের জন্য ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন করা যেতে পারে।
- ২০০৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ২০ কোটি টাকা দক্ষতা উন্নয়ন ফান্ডে বরাদ্দ রাখা হয়। বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের উচ্চ শ্রম উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উক্ত ফান্ড শক্তিশালী করা যেতে পারে।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা এবং শিশুদের যত্ন প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে (এনজিও) সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ফান্ড গঠনের ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে।
- স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের তাদের কারখানা ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হতে বিশেষায়িত গার্মেন্টস পল্লীতে স্থানান্তরের জন্য একটি কারখানা স্থানান্তর ফান্ড গঠন করা যেতে পারে।
- তৈরি পোশাক শিল্প উদ্যেক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য ক্রেডিট সহায়তা স্কিম গঠন করা যেতে পারে।
- পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে শূন্য শুল্ক সুবিধা নীতি বহাল রাখা যেতে পারে।
- বস্ত্র খাতের কাঁচামালের ওপর ২০০৭ সালের বাজেটে আরোপিত আমদানি শুল্ক ছাড় অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- ময়লা পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের ওপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে শুণ্য শতাংশে হ্রাসকরণ উদ্যোক্তাদের পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের জন্য শিল্প ইউনিট স্থাপনে উৎসাহী করবে।
- তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের মধ্যে যারা ৩০ জুন ২০০৭ এর মধ্যে নূন্যতম মজুরির হার বাস্তবায়ন করবে না, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৮ নতুন বন্দর এবং সেতুসমূহ

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের আধুনিকীকরন এবং প্রস্তাবিত নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।
- পদ্মা সেতু এবং যমুনা নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৫.৯ পরিবেশ

- পরিবেশ দূষণকারী শিল্পের উপর পরিবেশ দূষণ কর (Polluters Pay Principle) নীতি আরোপিত হতে পারে। বিভিন্ন শিল্প কর্তৃক উদ্ভূত সকল অজৈব বর্জ্য পদার্থ বিশেষ করে যদি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট শর্তাধীন সময়ের মধ্যে স্থাপন করা না হয়, তবে ওই সমস্ত শিল্পের ওপর ৫ শতাংশ হারে পরিবেশ দূষণ কর বা গ্রিন ট্যাক্স আরোপ করা যেতে পারে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যেক্তাদের যেসব ইউনিটে পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব রয়েছে, বিশুদ্ধ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার প্রসার ও উৎসাহিত করতে তাদের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারে।
- দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের যোগান দেওয়া যেতে পারে।

- দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি পরিকল্পনা করার জন্য পরামর্শ ও নির্মাণ ফি বাবদ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যেক্তাদের সফট লোনের জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।
- পুন ব্যবহারকৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক কমানো যেতে পারে।
- পরিবেশ দূষণ করের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পের দূষণ হ্রাসের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি স্থাপনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. প্রান্তিক জনগণের প্রয়োজনীয়তা

৬.১ অক্ষম ও প্রতিবন্ধীদের সুবিধাসমূহ

- যেসব পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শিশু প্রতি ১০,০০০ টাকা করে আয়কর অব্যাহতি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (যেমন-শ্রবণযন্ত্র, হুইল চেয়ার) আমদানির ওপর থেকে শুল্ক কমানো যেতে পারে।
- এ বিশেষ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা খরচ কমানোর জন্য সহায়তা হিসেবে ফিজিওথেরাপি সেবাসমূহের উপর থেকে ভ্যাট তুলে দেওয়া যেতে পারে।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসংক্রান্ত স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত জিনিসপত্রের ওপর থেকে কর অব্যহতি রাখা যেতে পারে।
- সরকার ২০০৭ অর্থবছরের বাজেটে এসিডদগ্ধ মহিলাদের ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থ বরাদ্দ কম রেখেছিল। এ জন্য সরকার আসন্ন বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অন্তর্ভুক্ত ফান্ডের পরিমাণ বাড়াতে পারে।
- এসিড দগ্ধ মহিলাদের জন্য সকল সরকারি হাসপাতালে আলাদা ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- যেসব দরিদ্র মহিলারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার, তাদের চিকিৎসা ও আইনগত সহযোগিতার জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৬.২ বস্তিবাসী

- ঢাকা নগরী এবং এর উপ-নগরীতে বসবাসকৃত ১০-১২ লাখ বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। এ সমস্ত জনগণের জন্য উপযোগি স্থান নির্বাচন করে (যেমন- সাভার, নরসিংদী, টঙ্গি এবং গাজীপুর) তাদের পুনর্বাসন করা যেতে পারে যাতে তারা কর্মস্থল এবং বাসস্থানে সহজে যাতায়াত করতে পারে।

৭ . কর প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস

- প্রত্যেক কর দাতার কর পরিচিতি নম্বার (TIN) সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৈরি করা উচিত, যার মাধ্যমে নির্ধারিত কর পরিচিতি নম্বার থেকে কর সংগ্রহের পরিমাণের প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং পাশাপাশি কর আদায় ও প্রত্যক্ষ কর এড়ানোর সত্যাসত্য অনুধাবন করা যাবে।

- ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের কর সংগ্রহের আওতায় আনা উচিত। বাজার কমিটির সহায়তায় খসড়া ও তৈরিকৃত লভ্যাংশের হিসেবের ওপর স্থানভিত্তিক কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া হয়রানি ব্যাতিত রাজস্ব সংগ্রহে এবং বিপুল পরিমাণে নতুন কর দাতা এবং উদ্যোক্তাকে করের আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটি ফলপ্রসূ পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।
- হার্মোনাইজড সিস্টেম (HS) কোডের সমন্বয়করণ কর ফাঁকি এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিধি কমাবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যদি একটি যথাযথ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যায়, তবে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ক্রমে কমে আসবে। কারণ কাস্টম পয়েন্ট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে যদি অনলাইন নেটওয়ার্ক গড়া যায় তাহলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে রাজস্ব সংগ্রহের তথ্য দ্রুত এবং নিয়মিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো যাবে।
- সৎ ও নিয়মিত আয়কর প্রদানকারীরা যেন আপীলেট ট্রাইব্যুনালে সুবিচার পায় সেজন্য অতীতের পদ্ধতির সাথে সমন্বয় রেখে বিচার বিভাগের একজন সদস্য নিয়ে ট্রাইব্যুনালটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে।
- একটি সংশোধিত কমিটি বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্য আপীল এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। যদি করদাতাদের প্রতি অবিচার ও ত্রুটিপূর্ণ আদেশেরে জন্য যথাযথ সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- যদি কেউ কর প্রদান না করে তবে উপ-কর কমিশনারের কাছে সেই ক্ষমতা থাকবে যাতে কর প্রদান না করা অর্থের ওপর দন্ড প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রার দণ্ড কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিধি সংকুচিত হবে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ভ্যাট নিবন্ধন করা হলে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর এবং আমদানিকারকদের অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হবে না।
- আইনে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের জন্য একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। কর অবকাশ পাওয়ার যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণে এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সংজ্ঞার অস্পষ্টতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত না হওয়ার কারণে কর অবকাশের সুযোগ পায় না। কোন কোন সময় কর কর্মকর্তারা এ অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

৪

বন্যা-উত্তর বাংলাদেশের কৃষি

মাঠ পর্যায়ের অবস্থা ও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ

বর্তমান বছরে বাংলাদেশ আরও একবার ব্যাপকভাবে বন্যাক্রান্ত হয়েছে। দেশের ৩৯টি জেলার ২৬২টি উপজেলা বন্যাপীড়িত হয়েছে। এ সকল উপজেলার অধিকাংশই দু'বার বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বন্যার পর পানি এমন সময়ে সরে গেছে এবং যাচ্ছে, যখন আমন ধান আবাদের মাধ্যমে ক্ষতি পোষানো সম্ভব নয়। তাই বন্যাকবলিত পরিবারে খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বন্যায় ৩ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমির ধান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে এবং ১ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমির ধান আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে। হেক্টর প্রতি ৩ টন ফলন ধরলে উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে ৮ লাখ মেট্রিক টন চাল।

বন্যায় কৃষকের ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ চলমান কৃষি কার্যক্রমের অবস্থা এবং কৃষি পুনর্বাসনে কৃষকের প্রয়োজনীয়তা নিরূপনের লক্ষ্যে আমরা গত ৪৬ অক্টোবর ২০০৭ বিভিন্ন এলাকায় মাঠ পরিদর্শন ও কৃষকের সাথে আলোচনা করি। আমরা যে সকল এলাকা পরিদর্শন করি তার মধ্যে রয়েছে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়ার ধুনট, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট। আমাদের ভ্রমণপথে মাঠে ফসলের অবস্থা এবং মাঠ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আমরা প্রতিটি এলাকায় ২০৩০ জন কৃষকের সাথে আলোচনা করি। বন্যা পরবর্তী কৃষি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং এ সকল অঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বন্যার প্রকৃতি এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত হই। ব্র্যাকের স্থানীয় অফিস এ সকল আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। আমরা ব্র্যাকের সংশিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সভাসমূহে উপস্থিত কৃষকদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা যে সকল তথ্যাদি অবগত হই তা নিচে বর্ণিত হলো।

মাঠ পর্যায়ের অবস্থা

কৃষকরা জানান যে, তারা ২০০৭ সালে অন্যান্য বছরের তুলনায় (২০০৪ এবং ১৯৯৮ সালের বন্যার তুলনায়) এ বছর ভিন্নধর্মী এক বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ বছর বন্যা হয়েছে পরপর দু'বার এবং তার ফলে প্রথম বন্যার ক্ষতি পোষানোর জন্য কৃষকদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। প্রথম বন্যায় ক্ষতি হয়েছিল মাঠের শস্য, বীজতলা, নার্সারির চারা, মাছ, পোল্ট্রি খামার এবং কিছু পরিমাণ গবাদি পশু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু। প্রথম বন্যার পরপরই কৃষকরা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমন ধান আবাদের প্রয়াস পায় এবং সীমিত এলাকায় সবজির চাষ করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্বিতীয় বন্যা কৃষকদের এ প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। দ্বিতীয় বন্যায় আমনের কচি চারাগুলো এক সপ্তাহের বেশি সময় পানিতে ডুবে থাকে এবং তার ফলে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

আর্থিক সমস্যা ছাড়াও এ সময়ে আবার নতুন করে আমন আবাদের মৌসুম নেই। আমাদের ভ্রমণপথে আমরা দেখতে পাই যে মাঝারি ও নিচু এলাকায় মাঠ ছিল ফাঁকা অথবা পানিতে ভরা। কেবলমাত্র উঁচু এলাকাতেই মাঠে শস্য দেখা যাচ্ছিল। যদিও কৃষকরা জানে যে এখন আমন ধান রোপন

করলে ফলন হবে খুবই অল্প, তারপরও কিছু কৃষককে আমন ধানের চারা লাগাতে দেখা গিয়েছে। আমনের চারা লাগানোর ক্ষেত্রে তাদের আশা হচ্ছে যে ধান না হলেও গোখাদ্য হিসেবে তা ব্যবহার করা যাবে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, বর্তমানে বন্যাক্রান্ত এলাকাসমূহে গোখাদ্যের সংকট চলছে।

কৃষকরা জানান যে, বোরো ধান ও হাইব্রিড ভুট্টা আবাদের আগে জমি ফেলে না রেখে তারা সেখানে সরিষা, সবজি, মরিচ ও আলুর আবাদ করবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাভজনক শস্যের আবাদ বৃদ্ধি, ভালো জাতের বীজ, প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার ও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষতি পোষানোর প্রয়াস চালাবে। তবে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে জমিতে এখনও পানি থাকার কারণে এ সকল এলাকায় বোরো ধানের আগে অন্য ফসলের আবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। এ সকল এলাকায় বোরো ধানের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কৃষকদের আর কোন গত্যন্তর নেই। এ সকল এলাকার ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান একটি বিরাট সমস্যা। কতিপয় এলাকায় পানিতে অনেককে মাছ ধরতে দেখা যায় যাতে তাদের কিছু আয় রোজগার হচ্ছে। ধুনট এবং লালমনিরহাট এলাকায় কৃষকরা পুরোদমে জমি তৈরির কাজে ব্যস্ত।

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে আমাদের নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে যে, এ বছরের বন্যা ছিল খুবই এলাকাভিত্তিক। নদী ও খালের উভয় পাশে কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রাম এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে যাবার কারণে ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা বেড়েছে। যেহেতু এ সকল এলাকা বেশ নিচু, তাই আমন মৌসুমে বেশিরভাগ জমি পতিত থাকে এবং কিছু জমিতে নিম্ন ফলনশীল গভীর পানির বোনা আমন ধান আবাদ হয়। এ সকল এলাকার মূল ফসল বিন্যাস হচ্ছে এক ফসলী বোরো ধানের আবাদ। তাই বন্যার কারণে আক্রান্ত পরিবারসমূহে দুর্ভোগ এবং যে সকল কৃষক রোপা আমনের চাষ করেছিল তাদের উলেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক ধান উৎপাদনে এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হবে। বন্যামুক্ত এলাকার আমন ফসলের অবস্থা ভালো বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য, বেশ কিছু জমির ধানের পাতা হলুদাভ ছিল, যা কিনা জমিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি নির্দেশক এবং এর ফলে ফলন কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ পর্যন্ত যেহেতু বৃষ্টিপাতের ধরন ছিল অনুকূল, তাই আশা করা যায় বন্যামুক্ত এলাকায় আমন ধানের ফলন কিছুটা হলেও ভালো হবে। বন্যামুক্ত এলাকায় অতিরিক্ত উৎপাদন বন্যা আক্রান্ত এলাকার উৎপাদনের ক্ষতি সামান্য পরিমাণে পোষাতে সক্ষম হবে।

বন্যা আক্রান্ত এলাকা

কৃষকরা তাদের উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি নিয়ে বেশ চিন্তিত। এ বছরে বীজের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে কেননা, যে সকল কৃষক বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ধান বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। এ বছরে হাইব্রিড ভুট্টা আবাদ বাড়াবে বলে কৃষকরা জানায়। গত বছর ভুট্টা চাষে অনেক লাভ হয়েছে বিধায় এবং বাজারে ভুট্টার দাম চড়া থাকায় তারা বেশি করে ভুট্টার আবাদ করবে।

ধানের দাম কৃষকদের অনুকূলে থাকার কারণে তারা অধিক পরিমাণ বোরো ধান উৎপাদনে উৎসাহী। কিন্তু গত বছর বোরো ধান আবাদ উপযোগী সকল জমিতে বোরো ধান চাষ করার কারণে এ বছর বোরো ধানের আবাদি এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তারা অধিক পরিমাণ জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ করবে বলে জানায়। হাইব্রিড ধানের ফলন বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ব্রিধান ২৯এর তু লনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। তাই যে সকল কৃষকের ঘরের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে তাদের অনেকেই এ বছর হাইব্রিড ধানের আবাদ করতে চায়। তাই হাইব্রিড ধান এবং ভুট্টা বীজের চাহিদা এ বছর উলেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আলু বীজের চাহিদাও বাড়বে। বাজারে সরিষা ও সবজির বীজ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইব্রিড ভুট্টা, ধান এবং আলু বীজের প্রাপ্তি নিয়ে

কৃষকদের মনে শঙ্কা রয়েছে। সরকার এবং বেসরকারি বীজ এজেন্সিগুলোর এ বিষয়টিকে আমলে নেওয়া দরকার।

কৃষকরা জানান যে, বাজারে ফসফেট ও পটাশ সার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও ইউরিয়া সারের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে ইউরিয়া সার সংগ্রহ বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। ইউরিয়া সার কেনার জন্য স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির কাছ থেকে সনদ সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তার পেছনে কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পরও পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পাওয়া যায় না। চাষিরা জানান যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরিয়া সার না পাওয়ার কারণে ফলন কম হচ্ছে। আমাদের ভ্রমণপথে দু'পাশের মাঠে অনেক জমির আমন ধানের পাতার রং গাঢ় সবুজের পরিবর্তে হালকা সবুজ রংএর দেখা গেছে, যা কিনা জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া সারের) ঘাটতির পরিচায়ক।

কৃষকরা বর্তমানে সরকার কর্তৃক ইউরিয়া সার বিতরণের পরিবর্তে প্রচলিত খোলাবাজারের মাধ্যমে সার ক্রয়ে আগ্রহী। তারা জানান যে, দাম বেশি দিতে হলেও খোলাবাজারের মাধ্যমেই তারা ইউরিয়া সার কিনতে চায়। কেননা, অনেকেই সরকার নির্ধারিত কেজি প্রতি ৬ টাকার পরিবর্তে ১০৯২ টাকা দ রে কালোবাজারে কিনতে বাধ্য হয়েছে। তারা আরও জানান যে, বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের চাহিদার মাত্র ৫০-৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার পাচ্ছেন।

কৃষকদের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শুকনো মৌসুমে সেচ দেওয়া। ডিজেলচালিত পাম্পের আওতাধীন কৃষকরা ক্রমবর্ধমান সেচ খরচের বিষয়ে অভিযোগ করেন। বেশিরভাগ কৃষকই সেচ ইঞ্জিন মালিকের কাছ থেকে সেচের পানি ক্রয় করে থাকেন। এলাকাভেদে তিন পদ্ধতিতে সেচ খরচ প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শস্য ভাগ প্রথা, একর ভিত্তিক নির্দিষ্ট সেচ খরচ আদায় এবং সেচ মেশিন ভাড়া প্রথা – যেখানে কৃষকরা নিজেরা ডিজেল কিনে দেয়। বোরো ধানের ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে বিঘা প্রতি সেচ খরচ ছিল ১২০০৯৫০০ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে ২০০০২৪০ ০ টাকা হয়েছে। একর ভিত্তিক নির্দিষ্ট সেচ খরচ ব্যবস্থায় সাধারণত কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে গাছে ফুল আসার আগে সেচের সকল খরচ পরিশোধ করতে হয়। শস্য ভাগ প্রথার ক্ষেত্রে শ্যালো ইঞ্জিনের মালিক সেচ প্রদানের জন্য এক চতুর্থাংশ ভাগ পান এবং তা জমিতে ধান থাকার সময়ই ভাগ করে দেওয়া হয়। আমাদের টাঙ্গাইল সভায় একজন সেচ ইঞ্জিনের মালিক জানান যে, তিনি আগামী বোরো মৌসুমে সেচ খরচ বাবদ উৎপাদিত ফসলের ৩৭ শতাংশ দাবি করবেন। কেননা ডিজেলের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে, তাই আগামী বোরো মৌসুমে ডিজেলের খরচ সেচের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হতে পারে। বিদ্যুতের মাধ্যমে সেচ প্রদানকারী কৃষকরা শস্য উৎপাদনের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি জানান।

কৃষকরা জানান যে, তারা প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ ক্রয় ও জমি তৈরির জন্য মেশিন ভাড়ার জন্য অর্থ সংকটে ভুগছে। তারা জানান যে, প্রতি একর সরিষার জমির জন্য তাদের সাড়ে ৪ হাজার নগদ টাকার দরকার। একর প্রতি আলু উৎপাদনের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হবে ৪৫ হাজার টাকা এবং ভুট্টার জন্য লাগবে সাড়ে ৭ হাজার টাকা। সেচ খরচের ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতির তারতম্যের কারণে প্রতি একর বোরো চাষের জন্য তাদের ৬ থেকে ১২ হাজার টাকা নগদ লাগবে। তাই তাদের দাবি, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করে। কৃষকরা আরও জানান যে, ব্র্যাক যদি বর্তমানে প্রচলিত সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ প্রদান করে, তাহলে তারা এ ধরনের ঋণ গ্রহণে এবং পরিশোধে সক্ষম হবে না। তারা ফসল সংগ্রহের পর এক বা দুই কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শস্য ঋণ চায়।

কৃষকদের জীবিকা এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বন্যার প্রভাব ছিল ভয়াবহ। আগামী বোরো মৌসুমে ক্ষতি পোষানোর জন্য কৃষকদের রয়েছে নিজস্ব পরিকল্পনা। এজন্য সরকার, ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদন উপকরণ সরবরাহকারী সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি থেকে সহযোগিতা পাবার অধিকার তাদের রয়েছে। কৃষকদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্যোগে সরকার, বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিওসমূহ সহায়তা দানের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে খাদ্য নিরাপত্তা

নিশ্চিত করা দরকার। ২০০৭ সালের বন্যার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: কতিপয় নীতি পরামর্শ

কৃষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আমরা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী মৌসুমে তাদের উৎপাদন পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কেও বিস্তৃত ধারণা পেয়েছি। একই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে পারেন বলে মনে করেন তাও জানতে পেরেছি। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি ও নীতি সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ নিচে দেওয়া হলো।

শস্য পুনর্বাসন কর্মসূচি

সরকার প্রান্তিক কৃষকদেরকে আমন ও বোরো মৌসুমে বিনামূল্যে উপকরণ সরবরাহের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতিমধ্যে বন্যাকবলিত এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৩৭ হাজার ৩ শত হেক্টর জমিতে বোরো ধান, ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে গম, ৮ হাজার ৮ শত হেক্টর জমিতে ভুট্টা, ৭ হাজার হেক্টর জমিতে ডাল, ৯ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা এবং ৬ হাজার ৫ শত হেক্টর জমিতে সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকার কৃষি উৎপাদনে প্রণোদনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত এ কর্মসূচি যৌক্তিক। তাই আমরা এ কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাই।

এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে কর্মসূচির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে কিনা এবং সামগ্রিকভাবে কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কিনা। সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং তাদের কাছে উপকরণসমূহ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যার কথা সুবিদিত। এ বছরের বন্যা ছিল খুবই অঞ্চলভিত্তিক (Highly localized) এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিও হয়েছে ব্যাপক। তাই সরকার যদি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন এবং সম্ভব হলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম চিহ্নিত করে ঐ সকল গ্রাম ও ইউনিয়নের সকল কৃষককে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় নেয়, তাহলে তা সুফল বয়ে আনবে। সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সকল কৃষক পরিবারকে ২ বস্তা ইউরিয়া সার, ১ বস্তা করে ফসফেট ও পটাশ এবং ১০ কেজি হাইব্রিড ধান ও হাইব্রিড ভুট্টার বীজ সরবরাহ করতে পারে। উক্ত পরিমাণ বীজ ও সার বিতরণ করলে প্রতিটি পরিবার তার মাধ্যমে ২ বিঘা পরিমাণ জমিতে দু'টো লাভজনক ফসল আবাদের জন্য বীজ ও সারের সুবিধা পাবে। ফলে প্রান্তিক কৃষকরা কার্যকরভাবে এ সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি বৃহদাকার খামারসমূহও কিছু সুবিধা ভোগ করবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে গম ও সবজি আবাদ হবে তুলনামূলকভাবে কম এলাকায় এবং ডাল ও সরিষার জন্য উপকরণের প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে কম। কৃষকেরা এ সকল শস্যের আবাদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে সক্ষম। তাই আমাদের সুপারিশকৃত কর্মসূচি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বন্যা-উত্তর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নকে সহজসাধ্য করবে।

সার বিতরণ ব্যবস্থা

আমরা যে সকল এলাকা পরিদর্শন করেছি, সে সকল এলাকার কৃষকদের মধ্যে সারের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে এবং তাদের ভাবনা হচ্ছে যে, আগামী কয়েক মাসে ফসল আবাদ পুরোপুরি শুরু হলে

সারের সমস্যা প্রকট হবে। সার বিতরণের বর্তমান পদ্ধতি কৃষকদের পছন্দ নয়। উলেখ্য যে, বর্তমানে ইউরিয়া সার স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মী এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদত্ত সার কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ হয়ে থাকে। সার সংগ্রহের জন্য অহেতুক বিলম্ব এবং সময় নষ্টের বিষয়টি বিবেচনা করলে সার বিতরণের বর্তমান পদ্ধতিটিকে দক্ষ ব্যবস্থা বলা যায় না। কৃষকরা আরও জানান যে, নগদ টাকার ঘাটতি থাকার জন্য তারা একত্রে মৌসুমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সার একসাথে না কিনে কয়েকবারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কিনতে আগ্রহী। কিন্তু সার বিতরণের বর্তমান ব্যবস্থায় এ ধরনের কিস্তিতে সার ক্রয়ের সুযোগ নেই। তাই তারা খোলাবাজারের মাধ্যমে সার ক্রয়ে আগ্রহী। উলেখ্য যে, কয়েক বছর আগেও খোলাবাজারে ইউরিয়া সার বিক্রি হত।

প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, খোলাবাজারে ইউরিয়া সার বিক্রির কর্মসূচি সফল করতে হলে সারের সরবরাহ চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সরবরাহে ঘাটতি থাকলে খোলাবাজারের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকরাই দুষ্প্রাপ্য সার কেনার সুযোগ পাবে এবং দরিদ্র কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের সারের কোনো সংকট নেই। গত ৯ অক্টোবরের ইউরিয়া সার সরবরাহ ও বিতরণের দৈনিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট সার মজুদের পরিমাণ হচ্ছে ৫ লাখ ১৫ হাজার মেট্রিক টন যার মধ্যে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন মজুদ রয়েছে বিভিন্ন জেলায়, ২ লাখ ১৬ হাজার মেট্রিক টন মজুদ রয়েছে কারখানা পর্যায়ে এবং ২ লাখ ৩ হাজার মেট্রিক টন মজুদ রয়েছে বাফার স্টক হিসেবে। কৃষকগণ কর্তৃক বিভিন্ন ফসলে যে পরিমাণ সার দেওয়া হয়ে থাকে তার ভিত্তিতে আমাদের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে আগামী বোরো এবং রবি মৌসুমে দেশে ১৬ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের চাহিদা রয়েছে। আগামী তিন মাসে দেশে যদি ৪ লাখ টন সার উৎপাদন হয় তাহলে চাহিদা মেটানোর জন্য আরও ৭ লাখ মেট্রিক টন সার আমদানির ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববাজারে বিদ্যমান ইউরিয়া সারের দাম (টন প্রতি ৩৪০ ডলার, সিআইএফ ভিত্তিতে) বিবেচনায় নিয়ে উক্ত পরিমাণ সার আমদানির জন্য ১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের একার পক্ষে এ ব্যয় বহন করা সম্ভব কিনা।

বর্তমানে বাজারে ইউরিয়া সার বিক্রি হচ্ছে ৬ টাকা কেজি দরে। এ দাম বেশ কয়েক বছর আগে ঠিক করা হয়েছিল। এ সময়কালে ধানের দাম দ্বিগুণ হয়েছে এবং বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আমদানিকৃত ফসফরাস ও পটাশ সারের দাম আড়াই গুণ হয়েছে। বর্তমান বিশ্ববাজার দামে (প্রতি কেজি ২৪ টাকা) প্রতি কেজি ইউরিয়া সারে সরকার ১৮ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে, যা কিনা সরকার নির্ধারিত দামের প্রায় ৩ গুণ। রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার ইউরিয়া সারের দাম বাড়ায়নি, তাই ক্রমবর্ধমান বিশ্ববাজার দাম এবং স্থানীয় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিকে মোকাবিলা করেছে অধিক পরিমাণ ভর্তুকির মাধ্যমে। তারপরও প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় ইউরিয়া সার সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। উলেখ্য যে, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় প্রতি কেজি ইউরিয়া সারের বর্তমান দাম হচ্ছে বাংলাদেশী টাকায় সাড়ে ৯ টাকা। ভারত এবং মিয়ানমারে চোরাচালানের মাধ্যমে সার পাচার হয়ে যাওয়ার ভয়েও সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রি করছে বলে জানা যায়। এ সকল বিবেচনায় সরকার যদি ইউরিয়া সারের বাজার দাম ভারতের কাছাকাছি পর্যায়ে নির্ধারণ করে (ধরা যাক, প্রতি কেজি ৯ টাকা) তাহলে চোরাচালানের আগ্রহ কমবে এবং কৃষকরা উলেখযোগ্য পরিমাণ ভর্তুকি সুবিধা ভোগ করবে। এ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার অধিক পরিমাণ সার আমদানি করতে পারবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খোলাবাজারে ইউরিয়া সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারবে। খোলাবাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইউরিয়া সারের দাম সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করলে কৃষকরা তাতে খুব বেশি অসন্তুষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

বীজ সরবরাহ

বীজের সরবরাহ অনেকাংশে বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান বছরে ধান, ভুট্টা এবং আলু বীজের অতিরিক্ত চাহিদা থাকবে। এ বছর ফসলের দাম ভালো থাকায় এবং কৃষকদের মজুদকৃত বীজ নষ্ট

হয়ে যাওয়ার কারণে ধান এবং ভুট্টা বীজের বেশি চাহিদা থাকবে। কৃষকদের চাহিদা মাফিক অতিরিক্ত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি খাতকে এ সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা দরকার।

কৃষি ঋণের সরবরাহ

কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য, বিশেষ করে বন্যা আক্রান্ত কৃষকদের মধ্যে চলতি মূলধনের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংককে উৎসাহ দানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা দরকার। ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহেরও এক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য প্রচলিত পদ্ধতিতে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য ঋণ কৃষকদের জন্য কার্যকর হবে না। কৃষি ঋণ কার্যক্রম সফল করার জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহকে যথাযথ বিতরণ এবং আদায় পদ্ধতি ঠিক করা দরকার হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

বন্যা আক্রান্ত এলাকাসমূহে ভিজিএফ এবং ভিজিডি কর্মসূচি পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকারকে তৎপর হতে হবে। উলেখ্য যে, ২০০৭০৮ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, জিআরএর আওতায় ১ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে। বন্যাউত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচিকে সরকারের বিদ্যমান দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির সাথে সমন্বিত করা দরকার। ভিজিডি এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নির্বাচন, বিতরণ ও কর্মসূচির সামগ্রিক অবস্থা জানার জন্য স্বাধীন পরিবীক্ষণ দরকার।

আশা করা যায় যে, সমস্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দ্রুত দুর্দশা লাঘব এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিতরণ প্রক্রিয়ার অপচয় ও দুর্নীতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ভিত্তিতে প্রদত্ত ফিডব্যাক সরকারি কর্মসূচির প্রয়োজনীয় পরিমার্জনে সহায়ক হবে।

১১ অক্টোবর ২০০৭

৫

ঘুর্নিঝড় পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

কৃষকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ

প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড় সিডর গত ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম উপকুলে আঘাত হানে। ঘুর্নিঝড়ে বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং পিরোজপুরসহ বারটি জেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ঘুর্নঝড়ের শিকার হয়েছে বিশ লাখ পরিবারের ৮৭ লাখ মানুষ, বিনষ্ট হয়েছে ১৫ লাখ ঘরবাড়ি, ৪১ লাখ গাছপালা এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে ১০ লাখ একর জমির শস্য। ঘুর্নিঝড় এমন একটি সময়ে আঘাত হেনেছে যখন মাঠেমা ঠে ছিল আমন ধান। আমন ধান হচ্ছে এসকল এলাকার প্রধান ফসল। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে পরপর দুবার বন্যায় ফসল নষ্ট হবার কারণে পারিবারিক এবং জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা এমনিতেই হুমকির মূখে ছিল। কৃষিখাত এবং সামগ্রিকভাবে ঘুর্নিঝড় সিডরের অভিঘাত হবে মারাত্মক। তাই কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে আক্রান্ত পরিবারবর্গের জীবিকা পুনরুদ্ধার করা এখন একটি একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ।

চরম ক্ষতিপ্রস্থ চারটি জেলার ব্যাপক এলাকা আমরা গত ৬৮ ডি সেম্বর, ২০০৭ সরেজমিন পরিদর্শন করি। সেখানে আমরা কৃষকদের সাথে শস্যের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করি এবং কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আবশ্যকীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারনালাভে সমর্থ হই। আমরা মাদারীপুরবরিশাল-পটুয়াখালীবর গুনাপি রোজপুরবা গেরহাট-গোপালগঞ্জভা ঙ্গা সড়কপথে ভ্রমন করি। এসকল এলাকা ভ্রমনকালে আমরা কলাপাড়া (পটুয়াখালী), বেতাগী (বরগুনা) মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) এবং মোড়লগঞ্জ (বাগেরহাট) এলাকার প্রতিটি স্থানে ৩০৪০ জন ক্ষকের সাথে আলোচনা করি। স্থানীয় ব্র্যাক অফিসের সহায়তায় এসকল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাগুলোতে আমরা শস্য, মৎস্য খাতে ক্ষয়ক্ষতির ধরন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি যেসকল কৃষিকাজ অতি শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও খোঁজখবর নেই। আমরা জানতে চাই কিভাবে তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে চান এবং তাঁদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান এবং কি ধরনের সহায়তা তাদের প্রয়োজন। আমরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বরিশাল কেন্দ্রে কর্মরত বিজ্ঞানীদের সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা করি। এসকল কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃষক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞসহ ব্র্যাকের সংশিষ্ট সকল কর্মীবৃন্দকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

কৃষি উৎপাদনে ক্ষতি

খরিফ মৌসুমের প্রধান ফসল হচ্ছে আমন ধান। ঘুর্নিঝড়ের কারণে বেশিরভাগ জমির আমন ধানের গাছ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নুয়ে পড়েছে। আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান, যেমন বিআর৯১, বিআর-২৩ এবং স্বর্ণা ধান কাটার সময় হয়েছিল। ঘুর্নিঝড়ের কারণে এসকল ধান সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ সমস্ত জাতের ধান সম্পূর্ণভাবে মাটির সাথে মিশে গেছে এবং পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার পর আগাম জাতের ধানের আক্রান্ত জমির বিনষ্ট হওয়ার মাত্রা এতোটাই বেশি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকরা

ধান কাটার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তার পরিবর্তে তারা মাঠে গবাদি পশু ছেড়ে দিয়েছেন যাতে পশুরা কিছু খাদ্য পায়। উলেখ্য যে, বর্তমানে ঘুর্নিঝড়ে চরম বিপর্যস্ত জেলা সমূহের ১০২০ শতাংশ আমন ধানের জমিতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আমন জাতের চাষ হয়। মোট আমন আবাদি এলাকার ৮০৯০ শতাংশ জমিতে দেশি জাতসমূহের (বিভিন্ন মোটা ধান) আবাদ হয়ে থাকে। এসকল 'মোটা ধান' ঘুর্নিঝড়ের সময় ফুল আসার পর্যায়ে ছিল। ঝড়ের কারণে এসকল জাতের ধান আংশিকভাবে হেলে পড়লেও গত তিন সপ্তাহে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গাছগুলো সবুজ এবং ধান শীষে জমি ভরা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ধানের ফলন মোটামুটি ভালই হবে। কিন্তু কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেল যে নুয়ে পড়া ধানের আনুপাতিক হারের কারণে জমি ভেদে ফলন ৩০৫০ শতাংশ কম হ তে পারে। এসকল জমির ফসল কাটা হবে আগামি এক মাসের মধ্যে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ২০০৫ সালের কৃষি শুমারি (নমুনা জরিপ)-তে উফশী ও দেশি জাতের অংশ যেভাবে দেয়া আছে তার ভিত্তিতে আমন ধান উৎপাদনে আমাদের প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন (সারণী ৫.১)। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের সাথে আমাদের প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ। উলেখ্য যে, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী অধিক ক্ষতিগ্রস্থ চারটি জেলায় আমন ধানের ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ৫ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এবং চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বাকি আটটি জেলায় (বিশেষত বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও খুলনা) আমন ধানের ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ৫ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন।

সারণী ৫.১: ঘূর্ণিঝড়ে ধান ফসলের বিনষ্টের প্রাক্কলন

জেলা	সম্পূর্ণ বিনষ্ট ধান আবাদি এলাকা (হাজার একরে)	আংশিক বিনষ্ট ধান আবাদি এলাকা (হাজার একরে)	উৎপাদন ক্ষতি (চালের হিসাবে হাজার মেট্রিক টনে)	শুষ্ক মৌসুমে ধান আবাদি এলাকা (মোট শস্য আবাদি এলাকার শতাংশ)	শুষ্ক মৌসুমে অন্য শস্যের আওতাধীন এলাকা (মোট শস্য আবাদি এলাকার শতাংশ)
বাগেরহাট	৭৭	৪৬২	১৯০	২৮	১০
পিরোজপুর	৩৪	২৬৯	১১০	৩১	১৮
বরগুনা	৫৯	৪২০	১৭৮	২৫	২০
পটুয়াখালী	৫৯	৭৭৩	২৪৭	২২	২১
চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য জেলা	১০৬	১২৮৯	২৭৩	৪০	২৫
মোট	**৩৩৫**	**২৪৫৭**	**৯৯৮**	**৩৪**	**২৩**

উৎস: নিজস্ব প্রাক্কলন; রিপোর্ট অব দ্যা এগ্রিকালচারাল স্যাম্পল সার্ভে অব বাংলাদেশ ২০০৫।

সব্জি আবাদি জমির পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আমন ধানের আবাদি জমির তুলনায় তার পরিমাণ খুবই সামান্য। মাছ আবাদি পুকুরগুলোর পাড়ে বিনষ্ট সব্জি ক্ষেতের নিদর্শন পথচলতি যে কারোরই নজরে পড়ে।

রাস্তার দুপাশে এবং ধানী জমির মধ্যেম ধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ আবাদি পুকুর দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে এসকল পুকুরে গলদা চিংড়ি ও বিভিন্ন জাতের স্বাদু পানির মাছ আবাদ করা হয়েছে। অনেক চাষীই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে মাছ চাষে উলেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ করেছে। এসকল পুকুর ঘুর্নিঝড়ের সময়ে জলোচ্ছাসে পাবিত হওয়ায় পুকুরের সব মাছ খালবিল ও নদী নালায় চ লে গেছে। তাছাড়া গাছের পাতা ও ডালপালা পড়ার কারণে পুকুরগুলোর পানি বর্তমানে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে গেছে। অনেকে জানান যে, তাদের মাছের ক্ষতির পরিমাণ বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

উপকূলবর্তী দক্ষিণের জেলাসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সামাজিক বনায়ন হয়েছে। আবাদ করা হয় পান, রাস্তার দু'ধারে এবং বাড়ির আঙিনায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় বাঁশঝাড় এবং মেহগনিসহ অন্যান্য গাছের সারি। সমূলে উৎপাটিত গাছসহ বড় ও ছোট গাছ নষ্ট হয়েছে ব্যাপক পরিমাণে। অবশ্য ব্যাপক হারে গাছ না থাকলে ঘরবাড়ির ক্ষতি আরও অনেক বেশি হতো। সামাজিক বনের ক্ষতির পরিমাণ খুবই বেশি। মন্দের ভাল হচ্ছে এই যে, বর্তমানে এ সকল বিনষ্ট হওয়া গাছ কাটা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে লোকের কিছু আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। কাঠ, লাকড়ি ও ডালপালা পরিবহণকারী রিকশা ভ্যানের এবং ছোট ছোট ট্রাকের উপস্থিতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ঘূর্ণিঝড়ে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির ক্ষতি হয়েছে অনেক। এ সকল এলাকার কৃষকরা বর্তমানে হাল চাষের কাজে গবাদি পশুর ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়। বেশির ভাগ কৃষকই বর্তমানে ভাড়ায় পাওয়ার টিলার নিয়ে জমি তৈরির কাজ করে থাকেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা মূলত মৎস্য ও দুধের জন্য বর্তমানে গবাদি পশু পালন করে থাকেন। গবাদি পশুর বেশি ক্ষতি হয়েছে চরাঞ্চলে এবং নদী উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে, যেখানে ঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাসের আধিক্য ছিল বেশি। ঘূর্ণিঝড়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা পোল্ট্রি খামারসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রবি মৌসুমের কৃষি কর্মকাণ্ড

আমন ধান এ সকল এলাকার প্রধান ফসল। মোট ধান আবাদি এলাকার মাত্র ২৫ শতাংশে বোরো ধানের চাষ হয়। রবি মৌসুমে আবাদকৃত শস্যের মধ্যে রয়েছে ডাল (খেসারী ও মুগ), সবজি (আলু, মুলা, পালং শাক, লাউ শাক, মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে) এবং মরিচ। দেশের অন্যান্য এলাকাতে বর্তমানে বোরো ধান প্রধান ফসল হলেও এ সকল এলাকায় বোরো আবাদের ব্যাপক প্রসার এখনও হয়নি। নাবী ধানের আমন জাতের চাষাবাদ এবং মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় বিধায় এ সকল এলাকা বোরো চাষের অনুপযোগী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। আউশ মৌসুমে কিছু স্থানীয় জাতের আবাদ হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট শস্য এলাকায় ১০-২০ শতাংশ জমি বর্তমানে ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসল আবাদের উপযোগী। আমাদের সাথে আলোচনায় কৃষকরা আলু, ভুট্টা, মরিচ, তরমুজ এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের আগ্রহ দেখান। কতিপয় কৃষক গত বছর হাইব্রিড ভুট্টা চাষ করেছিলেন। ভুট্টার ফলন ও লাভ দেখে তারা খুব খুশি এবং এ বছর ব্যাপক আকারে ভুট্টা চাষে আগ্রহী। এক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে বীজ এবং চলতি মূলধনের অভাব। স্থানীয় জাতের আমন ধানের আওতাধীন বেশির ভাগ জমি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফাঁকা হবে। এ সকল জমির বেশির ভাগ আর্দ্র ও কাঁদা মাটি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধান চাষের উপযোগী। কৃষকরা জানান যে পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার বেশির ভাগ জমিতে এবং বাগেরহাট জেলার সীমিত এলাকায় নাবী জাতের বোরো এবং আশু জাতের আউশ ধান আবাদ করা সম্ভব। এ সকল এলাকায় বোরো আবাদ সম্ভব নয় বলে অনেকের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে তা কৃষকদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না। তারা জানান যে, জোয়ারের সময়ে আসা প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানি থেকে যায় খাল-বিল ও নালা সমূহে যার মাধ্যমে বোরো ধানের জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব। বাঁধের ভেতরের পানিও মিঠা থাকে। আমন ধান কাটার পর কৃষকরা উফশী জাতের বোরো ধান আবাদের জন্য আগ্রহী। অবশ্য এজন্য তাদের দরকার হবে বীজ, সার, সেচ ও জমি চাষের সুবিধা।

কৃষি কাঠামো

উফশী জাতের ধানের সীমিত আকারে চাষবাসের পশ্চাতে কাজ করে আসছে ব্যাপক হারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উপস্থিতি যাদের পক্ষে ব্যয়বহুল উফশী জাতের আবাদের জন্য মূলধনের অভাব রয়েছে। তাছাড়া, অনেক জমি ভাগ চাষের আওতায় থাকার কারণে এবং জমি মালিককে বর্গা চাষি অর্ধেক থেকে

দুই-তৃতীয়াংশ ফসল দিয়ে দিতে হতো বিধায় উফশী জাতের প্রসার তেমন একটা হয়নি। এ সকল এলাকার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কৃষকের নিজস্ব জমি নেই এবং আরও দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের জমির পরিমাণ এক হেক্টরের কম (সারণী ৫.২)। গড় খামার আয়তন হচ্ছে প্রায় আধা হেক্টর। প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবার ঋণ সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং ঋণের দুই-তৃতীয়াংশই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নেওয়া হয়ে থাকে। শস্য আবাদের জন্য ঋণ খুবই দুষ্প্রাপ্য। বর্গা প্রথার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে এ সকল এলাকায়। কৃষকরা জানান যে, প্রায় অর্ধেক জমিই বর্গায় নেওয়া।

বেশির ভাগ বর্গা জমিই নেওয়া হয় অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের কাছ থেকে যারা জমিতে কোন জাত আবাদ হবে সে বিষয়ে মাথা ঘামান না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য বর্গা প্রথার ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন হয়েছে। শস্য ভাগের পরিবর্তে বর্তমানে নির্দিষ্ট হারের নগদ বর্গা প্রথা চালু হয়েছে। এজন্য বর্গাচাষি বার্ষিক এবং কয়েক বছরের (তিন থেকে সাত বছর) জন্য বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ভিত্তিতে জমি আবাদের সুযোগ পান। এ প্রথার কারণে, বেশি পরিমাণে সার ও সেচের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে আবাদ করতে চাষিদের অনীহা নেই, তবে কৃষি ঋণের প্রয়োজন হবে বলে কৃষকরা জানান।

সারণী ৫.২: ঘূর্ণিঝড়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জমির মালিকানার বণ্টন

জেলা	গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা (হাজারে)	জমির মালিকানা বণ্টন					কৃষি শ্রমিক পরিবার (%)	গড় খামার আয়তন (একর)
		০.০৫ একর পর্যন্ত (%)	০.০৫ থেকে ০.৫ একর (%)	০.৫ থেকে ২.৫ একর (%)	২.৫ থেকে ৭.৫ একর (%)	৭.৫ একরের বেশি (%)		
বাগেরহাট	৩৩৩	২৭	৩২	৩০	১০	১	২৯	১.৩৯
পিরোজপুর	২৩০	১৯	৩৯	৩২	৯	১	১৫	১.১৮
বরগুনা	১৮৮	২০	৩৫	৩১	১৩	২	১৭	১.৫১
পটুয়াখালী	২৩০	২৯	৩১	৩১	১৩	৩	১১	১.৭৭
বাংলাদেশ	২৪,৫৬৪	৪০	২২	৩০	৬	১	২৯	১.২১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০০৬)। রিপোর্ট অব দ্যা এগ্রিকালচারাল স্যাম্পল সার্ভে অব বাংলাদেশ ২০০৫।

ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান

চরমভাবে ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত এলাকাসমূহের ২০-৩০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোন আবাদযোগ্য জমি নেই। ভূমিহীন পরিবারগুলোর অনেকেই আবার মাছ ধরা, পরিবহণ, ছোট ব্যবসাসহ বিভিন্ন অকৃষি কাজে জড়িত। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১০-১৫ শতাংশ পরিবার এবং পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলার ২৫ শতাংশ পরিবার কৃষি শ্রমিক। কৃষকরা জানান যে, বর্তমানে কৃষি শ্রমের বাজার খুবই প্রতিযোগিতামূলক এবং ধানের দামের সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত মজুরি বাড়ছে। গত বছর যেখানে দৈনিক মজুরি ছিল ১০০ টাকা, সেখানে বর্তমান বছরে দৈনিক মজুরি হচ্ছে ১৫০ টাকা। ত্রাণ কর্মসূচির কারণে ধান কাটার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে কৃষকরা বেশ ভাবিত। তাই আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহ কৃষি শ্রমিকদের কাজ পেতে খুব বেশি সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। ব্যাপকভাবে কৃষি পুনর্বাসন করা সম্ভব হলে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে এ সকল পরিবারের জন্য। তাছাড়া রাস্তা ও বাধ মেরামতের জন্য, বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য 'কাজের বিনিময় অর্থ' কর্মসূচি চালুর সুযোগ রয়েছে। মাছ ধরার জাল, পড়ে যাওয়া বাঁশ ও গাছ থেকে বন শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নারী-পুরুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

কৃষি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ

বোরো মৌসুমে ব্যাপক হারে ধান চাষ ও কৃষি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো হচ্ছে, জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার ঘাটতি ও উচ্চ খরচ। সীমিত সেচ সুবিধা এবং অনেক ক্ষেত্রে সেচ সুবিধা ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। শস্যের মানসম্পন্ন বীজের, নতুন শস্যের (উফশী ধান ও ভুট্টা) মানসম্মত বীজের অপ্রতুল সরবরাহ। তাছাড়া চলতি মূলধনের যোগানের জন্য কৃষি ঋণের অভাবও একটি বড় সমস্যা। কৃষক ও বিজ্ঞানীরা আমাদের জানান যে, এ সকল জেলার ব্যাপক এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে (আশু জাতের আউশ ধান আবাদে কারিগরি কোন বাধা নেই) সেচ সুবিধার অভাব এখানে একটি বড় অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। পাওয়ার টিলার পাওয়া গেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল এবং তার ভাড়াও বেশ বেশি যা বহন করা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নাগালের বাইরে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ও ভুট্টার আবাদ করতে হলে অবশ্য উৎপাদন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বিষয়েও কৃষকদের পরামর্শ সেবা দিতে হবে।

কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ

ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে স্বার্থকভাবে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্য কেবলমাত্র বীজ ও সার সরবরাহ করলেই হবে না। এ জন্য প্রয়োজন হবে গুচ্ছ (প্যাকেজ) কর্মসূচি যার মধ্যে থাকবে বীজ, জমি চাষের যন্ত্রপাতি, সেচ-পাম্প, সার এবং কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য কৃষি ঋণ। সেচ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। জমি চাষের যন্ত্রপাতির অভাবও বেশ প্রকট। গবাদি পশু মরে যাওয়ার কারণে সময় মতো জমি চাষ করাটা দুরূহ হবে। সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার এবং সেচের জন্য সেচ-পাম্প জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে। বাগেরহাট ছাড়া অন্যান্য এলাকায় (পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী) রাসায়নিক সারের অভাব সম্পর্কে কৃষকরা কিছু বলেননি। কেননা বর্তমানে কৃষকরা বেশির ভাগ জমিতে স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ করে থাকেন। ব্যাপক এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনের মাধ্যমে উফশী জাতের আবাদ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সহজ শর্তে কৃষি ঋণের সরবরাহ দরকার হবে। হাইব্রিড ভুট্টা ও উফশী জাতের ধান আবাদের জন্য উপাদান দরকার। জমি চাষের খরচ এবং সেচ খরচ বাবদ বিঘা প্রতি প্রায় ৪ হাজার টাকা নগদ লাগবে। তাই একজন চাষি দুই বিঘা জমিতে (গড় খামার আয়তন) শুষ্ক মৌসুমে আবাদ করতে হলে তার ৮ হাজার টাকার ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। কৃষকরা জানান যে, বর্তমানে প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে সাপ্তাহিক কিস্তি ভিত্তিক। তাই শস্য আবাদের জন্য এ সকল ঋণ সুবিধাজনক নয়। কৃষকরা ফসল কাটার পর এক বা দুই কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মৌসুমভিত্তিক কৃষি ঋণের দাবি জানান। মাছ চাষিদের ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা বেশি। প্রতি বিঘাতে মাছ চাষের জন্য ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণের দরকার হতে পারে বলে তারা জানান। এক্ষেত্রে ছয় মাস পর থেকে মাসিক ভিত্তিতে কিস্তিতে আদায় করা হলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

উপসংহার

প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে কৃষকদের জীবিকা ও জাতীয়ভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। আগামী শুষ্ক মৌসুমে কৃষকরা কীভাবে তাদের জীবিকা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং কৃষি উৎপাদনে নিবিড়তা বৃদ্ধি করতে পারবেন, সে সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও ভাবনা রয়েছে। এজন্য তাদের দরকার বিভিন্ন উপকরণ যেমন মানসম্মত বীজ, সেচ ও জমি চাষের জন্য যন্ত্রপাতি ও যথা সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সারের সরবরাহ। আমদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরকারি ও

বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ী এবং এনজিওগুলোর যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে কৃষকরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। সাথে সাথে জাতীয়ভাবে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সক্ষম হব। আমাদের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সক্ষম হব এবং সমৃদ্ধির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা গতিশীল হবে।

১০ ডিসেম্বর ২০০৭

বাজেট সংলাপ ২০০৭

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর উদ্যোগে ২০০৭ সালের ১৪ জুন সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে "বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনা ২০০৬২০০৭ এবং বা জেট বিশেষণ ২০০৭-২০০৮" শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ২০০৬০৭ অর্থবছরের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং ২০০৭ সালের ৭ জুন গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডি'র পর্যবেক্ষণ ও বিশেষণ সম্পর্কে আলোচনা। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সংলাপ অংশগ্রহণ করেন।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান এম সাইদুজ্জামান। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. এ. বি মির্জা আজিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সভায় অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা সংযোজন১ এ সং যোজিত হয়েছে।

সভাপতির প্রারম্ভিক মন্তব্য

অনুষ্ঠানের সভাপতি এম সাইদুজ্জামান উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, সরকারের বাজেট সংক্রান্ত বিশেষণ প্রস্তুত করা সিপিডি'র ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ, অর্থনীতিবিদগণ, পেশাদার এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ গণমাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বাজেট প্রস্তাবের দ্ব্যর্থহীন প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যেরা একে গতানুগতিক বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কেউ কেউ একে মজবুত আইনগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। জনাব সাইদুজ্জামান উলেখ করেন যে, ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে বিদ্যমান কাঠামোগত নানা সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টি এবারের বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে। যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। এই উপলব্ধি এবারের বাজেটের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ইতিবাচক দিক বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও অন্য যেকোন বছরের তুলনায় বাজেট সম্পর্কিত তথ্যউপা ত্ত স্বচ্ছতার সাথে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাও বাজেটে লক্ষ্য করা গেছে।

জনাব সাইদুজ্জামান তাই প্রস্তাবিত বাজেটকে বাস্তবতার নিরিখে প্রণীত, স্বচ্ছ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহসী বলে মন্তব্য করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান বাজেট জাতিকে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বাজেটে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক খাতে পূর্বাপেক্ষা অধিক বরাদ্দের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ, বিশেষ

করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) যে ঘাটতির মেটানোর সাহসী উদ্যোগ বাজেটে গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে সময়পোযোগী বলেও মন্তব্য করেন।

জনাব সাইদুজ্জামান আশা প্রকাশ করেন সম্মানিত আলোচকবৃন্দ প্রস্তাবিত বাজেটের আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিপিসিকে অর্থায়ন করার প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণ ও বন্ড সমূহের পরিপূর্ণতার কাঠামো কি হবে, এ বিষয়ে সরকারকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আলোচকবৃন্দকে অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, বাজেট পরস্পর বিরোধী হবে নাকি সম্প্রসারিত হবে, সে ব্যাপারেও আলোচনা হওয়া উচিত। সরকার কীভাবে উত্তরোত্তর বেতন বৃদ্ধির দাবি মোকাবেলা এবং সমন্বয় বিধান করবে এবং কীভাবে মূল্য বৃদ্ধির ইস্যু সামাল দেবে, সে বিষয়ও আলোচনা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। পরিশেষে, তিনি আশা করেন যে– আলোচনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কীভাবে বাজেট প্রস্তাব এবং বিনিয়োগ প্রস্তাবকে সম্পৃক্ত করা যায় তা বেরিয়ে আসবে। এরপর জনাব সাইদুজ্জামান সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর উপস্থাপনার শুরুতে অর্থ উপদেষ্টা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, উন্নয়নকর্মী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাবেক আইন প্রণেতাগণ এবং সংলাপে উপস্থিত অন্যান্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, সিপিডি ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের বাজেটের জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে অর্থ উপদেষ্টার নিকট পেশ করেছিল। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, সিপিডির বেশ কিছু প্রস্তাবনা ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ড. ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনার শুরুতে কিছু তথ্যউপা ত্ত ও বিশেষণ তুলে ধরেন, যার ভিত্তিতে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের বাজেট তৈরি হয়েছে। তিনি বিগত অর্থবছরের ইতিবাচক দিক সহ এ বছরের বাজেটের বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

২০০৭০৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপির বৃদ্ধি, আয়কর বৃদ্ধির অব্যাহত ধারা, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, পুঁজিবিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'টার্ম লোন' বা শিল্প ঋণ বৃদ্ধি, অব্যাহত রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি, বন্দর পরিস্থিতির উন্নতি, টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়ার গতিশীলতা।

অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিবাচক অর্জনগুলোর পাশাপাশি নেতিবাচক কিছু প্রবণতাও ছিল লক্ষ্যণীয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, দুর্বল রাজস্ব আদায়, রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণ প্রবাহের নিম্নহার, সরকার কর্তৃক অধিক ঋণ গ্রহণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বনিম্ন বাস্তবায়ন, সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ সংকট এবং পোশাকশিল্পে নতুন মজুরি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতাই ছিল আলোচ্য বছরের প্রধান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য।

এবারের বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো, দারিদ্র্য বান্ধব প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অসমতা দূরীকরণ, বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীন সঞ্চয় বাড়ানো, করের আওতা বৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির গুণগত মান বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ বৃদ্ধি, কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা এবং কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা ।

২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের বাজেটের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার সময় ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে পূর্ণ এক বছরের বাজেট প্রণয়নের ঘটনা এটাই প্রথম। সেই সূত্রে তিনি উলেখ করেন, খন্ডকালীন বাজেট প্রণয়নের চেয়ে মধ্যমমেয়াদি বাস্তবতা থেকে বাজেট

প্রণয়ন করা অনেক ভাল, অন্যথায় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত বাজেটের বৈধতার প্রশ্নে ড. ভট্টাচার্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৩ এবং অনুচ্ছেদ ৯৩'এর উ দ্বৃতি দেন, যেখানে স্পষ্টভাবে এ বাজেট প্রণয়নের বৈধতার কথা বলা হয়েছে।

ড. ভট্টাচার্য প্রস্তাবিত বাজেটকে একটা সময়ের পরিবর্তন বলেছেন কারণ, বাজেটে এই প্রথমবারের মতো সমাজে বিদ্যমান আয়ের জেন্ডার বৈষম্য এবং আঞ্চলিক অসমতাসহ বিভিন্ন রকম অসমতার কথা সরাসরি স্বীকার করা হয়েছে। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা আবারো সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলত্রের মূল নীতির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি আশা করেন, অর্থ উপদেষ্টার বাজেট প্রস্তাবনার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীরা পুনর্নিশ্চিত হবেন, কারণ অর্থ উপদেষ্টা ২০০৮২০১০ অর্থ বছরের জন্য তিন বছরের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) এর উলেখপূর্বক পিআরএসপি নীতির ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

একই সাথে ড. ভট্টাচার্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সম্পদের সহজলভ্যতার ধারনা মাথায় রেখে অর্থ উপদেষ্টা সরকারি ব্যয় নিরুপণের নীতির প্রতি অবিচল থাকবেন কি না। তিনি উলেখ করেন, চুড়ান্ত বিশেষণে ব্যয়ের যে আকার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা মেটাতে হলে অর্থ উপদেষ্টাকে এখন অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। উপস্থাপিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রস্তাব পৃথক পৃথক প্রস্তাব হিসেবে যুক্তিসঙ্গত হলেও এগুলোর সবই বাজেট কাঠামোর ওপর দন্ডায়মান, যা আপাতদৃষ্টিতে খুব দুর্বল। তিনি মন্তব্য করেন ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দালানের ছাদের ওপর আরও একটি তলা নির্মানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সিড়ি কতটা মজবুত সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে উপরতলায় যাওয়া যাবে। তিনি এই সিড়িকে অর্থায়নের সিড়ি হিসেবে উলেখ করেন। এই কারণে, এই বাজেটের ব্যাপারে বলা যেতে পারে অতীত থেকে একটা ছেদ টানার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, তবে পূর্ণসফলতা এখনও বাকি।

প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, ২০০৭০৮ অর্থ বছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ একটা চ্যালেঞ্জিং টার্গেট। তিনি উলেখ করেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৬০৭ অর্থ বছরের জন্য জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৭১ শতাংশ (অর্থবছর ২০০৫০৬) থেকে কমিয়ে ৬.৬২ শতাংশ নির্ধারণ করে। একইসাথে প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী এ লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৬.৫১ শতাংশ। কিন্তু প্রবৃদ্ধির নিম্নগতির কারণে সিপিডির বিবেচনায় প্রবৃদ্ধি ৬.৫১ শতাংশ থেকেও কমে ৬ শতাংশে নেমে যাবার আশংকা রয়েছে। আগামী অর্থবছরের জন্য সরকার যে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ নির্ধারণ করেছে, তা অর্জন করতে হলে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতে বড় ধরণের অগ্রগতি প্রয়োজন হবে এবং আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রবণতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন আগামী অর্থবছরে জিডিপির ন্যূনতম ১ শতাংশ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে যার আর্থিক পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। এই বিনিয়োগের উৎস হিসেবে আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ, পরিবার ও কর্পোরেট পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি, পুঁজির বাজারে নতুন অর্থ সরবরাহ এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর নজর দিতে হবে। এছাড়া বহুল পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন আছে বলেও তিনি উলেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কথা তুলে ধরেন, যার কারণে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা যথাযথভাবে কাঙ্খিত বিনিয়োগ করতে পারছি না।

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন যে, দুর্বল রাজস্ব কাঠামোর কারণে ২০০৬২০০৭ অর্থ বছরে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বাজেটেও ঘাটতি

থেকে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাজেট ঘাটতি গতবছর জিডিপির ৩.৭ শতাংশ থাকলেও এবছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ শতাংশে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) যে দায়ভার সরকার গ্রহণ করেছে– সে অংশটি বাদ দিলেও বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৪.২ শতাংশ। বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থায়ন ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩৪.৬ ও ৩৫.৪ শতাংশ। আর একারণেই ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋন সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তবে বৈদেশিক উৎস থেকে ঘাটতি পূরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ফলশ্রুতিতে সরকারকে আবার অভ্যন্তরীণ উৎস তথা ব্যাংক থেকে উচ্চহারে ধার নিতে হতে পারে বলে তিনি ধারণা করেন।

কর্মসংস্থান

ড. ভট্টাচার্য সিপিডির গবেষণালব্ধ তথ্যের বরাত দিয়ে (যা ২০০৬২০০৭ অর্থ বছরের পিআরএসপির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা) দেশে ৩০ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেন। জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে তিনি আরেকটি হিসেব উপস্থাপন করেন, যাতে মাত্র ১০.৫ লাখ চাকরির সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় উপাত্তের ব্যবধান দাড়ায় ২০ লাখ। প্রতি বছর শ্রমবাজারে ১২ থেকে ১৫ লাখ কর্মী প্রবেশ করে। একথা মাথায় রেখে এবং পিআরএসপির ২০০৭২০০৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা স্বীকার করে নিয়ে শ্রমবাজারে আগত প্রবেশানুরাগীদের কর্মসংস্থানের জন্য ৩০ লাখ চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, যারা ইতিমধ্যেই শ্রমবাজারে রয়েছে, সেই সব বেকার অথবা অর্ধ-বেকার শ্রমিকদেরকে এ তথ্যের সাথে যুক্ত করা হয়নি। ড. ভট্টাচার্য এদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং কর্মহীনতার উপাত্তের স্বল্পতার কথা তুলে ধরেন এবং এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। লেবার ফোর্স সার্ভে অব বাংলাদেশ (এলএফএস) দুইতিন বছ রের ডাটা এক খন্ডে প্রকাশ করেছে, কিন্তু তাতে হালনাগাদ তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে। এর ফলে, নীতি নির্ধারক এবং গবেষকগণকে বিশেষন এবং প্রাক্কলনের জন্য পরোক্ষ মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করতে হয়। ড. ভট্টাচার্য কর্মসংস্থানের বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন।

রাজস্ব আয়-ব্যয়

ড. ভট্টাচার্য রাজস্ব আয়ব্যয়ের হিসেব উত্থাপনকালে বলেন, ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরে সরকারি ব্যয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা গত সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮.৮ শতাংশ বেশি। কিন্তু তিনি গত অর্থবছরের ১৫.৮ শতাংশ রাজস্ব আয়ের বিপরীতে উক্ত ব্যয়ের (২৮.৮%) এত বড় লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে বলেন যে, এই উন্নয়ন ব্যয় মোট ব্যয়ের মাত্র ৩০.৪ শতাংশ। ২০০৬২০০৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৩ শতাংশ, এর বিপরীতে আগামী অর্থবছরে ১৫.৮ শতাংশ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে বলেই তিনি মনে করেন।

তাঁর মতে বিগত বছরগুলোর সঙ্গে তুলনামুলক চিত্রে ১৬.১ শতাংশ ভ্যাট আদায় বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত। সম্পুরক শুল্ক ও আমদানি শুল্কের উঠানামার প্রবণতার প্রেক্ষাপটে ১৮২০ শতাংশ আমদানি বেড়ে যাওয়ার ঘটনাকে তিনি অস্পষ্ট বলেছেন। এছাড়া ২০০৭২০০৮ অর্থবছরে বাজেটের জন্য রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর এবং করবহির্ভূত রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১২.৪ শতাংশ এবং ১২.১ শতাংশের ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষন করেন। পূর্বোক্ত তথ্যউপাত্ত এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেটের নিরিখে তিনি ২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাকে রক্ষণশীল বলে মন্তব্য করেন। যেহেতু বিগত বছরগুলোতে স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা

গেছে, সেহেতু তিনি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জনসাধ্য বলেই মনে করেন। যদি রাজস্ব আয়ের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়, তারপরও সামগ্রিক ট্যাক্স জিডিপির অনুপাত ১১ শতাংশের নিচে এসে দাঁড়াবে, যা– ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, এমন কি নেপালের মতো দেশের চেয়েও কম। তাই এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যদি বেশিও অর্জিত হয়, তাহলেও তুলনামূলক মূল্যায়নে তার দুর্বলতা রয়েই যাবে।

সরকার ২০০৭২০০৮ অর্থবছরে ৭৪২৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। ড. ভট্টাচার্য সিপিডির বিশেষণের বরাত দিয়ে বলেন, মোট সংযুক্তির সাথে এনবিআরএর অংশ যুক্ত হবে ৮১.৪ শতাংশ এবং এরই সাথে অ-শুল্ক উপাদান যুক্ত হবে ১৫.৮ শতাংশ। এই উপাত্তের আলোকে ড. ভট্টাচার্য মনে করেন যে, প্রথমত, বাংলাদেশের রাজস্ব গঠন কাঠামো এখন বাণিজ্য শুল্ক থেকে সরে গিয়ে ক্রমশ অভ্যন্তরীণ করের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কর আদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি তাই সঙ্গতকারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসেরই ইঙ্গিত বহন করে, যা ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস, বিশেষ করে ভ্যাট ও আয়করের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যদিও রাজস্ব আদায় ভ্যাট ও আয়কর নির্ভর হচ্ছে, তবু অভ্যন্তরীণভাবে প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ করের ওপর চাপটা বেশিই থাকছে। বর্ধিত ৭৮২৯ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ভ্যাট অবদান রাখবে ২৮.২ শতাংশ, আর আয়কর অবদান রাখবে ২৪.৪ শতাংশ। ফলে দেখা যাচ্ছে যাদের আয় উচ্চ নয় তাদেরকেই তুলনামূলক বেশি ভ্যাট দিতে হবে।

ব্যয়

২০০৭০৮ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৫.৩ শতাংশ। ড. ভট্টচার্য বলেন, যেহেতু রাজস্ব ব্যয় বিগত বছরগুলোতে পদ্ধতিগতভাবেই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে গেছে, সেক্ষেত্রে অবশেষে রাজস্ব ব্যয় ১৫.৩ শতাংশের মধ্যে রাখা দুষ্কর হয়ে যাবে। এই রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যেই ভর্তুকি ও চলতি বিনিময়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি দৃশ্যমান হবে। বাজেটের সূত্রানুসারে সুদ পরিশোধের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১৫.৭ শতাংশ আর এই পরিপ্রেক্ষিতে ড. ভট্টাচার্য একে সুদ পরিশোধের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি বলে মনে করেন। রাজস্ব বাজেটের ২২ শতাংশ ব্যয় করা হবে ঋণ সেবা দায় পরিশোধে, যা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রকারান্তরে মোট ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশে এবং অন্যান্য ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে ৪৩.৪ শতাংশে। ড. ভট্টাচার্য ব্যয় বৃদ্ধির এই উচ্চমাত্রার জন্য বিপিসির দায়কে প্রধান কারণ বলে উলেখ করেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যদিও ২০০৭২০০৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার এডিপি ২৩ শতাংশ বেশি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওই প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করা খুব কঠিন হবে।

ঘাটতি

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, ২০০৭২০০৮ অর্থবছরের জন্য জিডিপির শতকরা ৫.৬ ভাগ ঘাটতি স্থির করা হয়েছে। এর একটা বড় কারণ হলো বিপিসির ঋণের দায় বা দেনা। তার মতে বিপিসির বাদ দিলেও ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৪.২ শতাংশ। ফলে আর্থিক ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই যাচ্ছে। ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, এই বাড়তি ঘাটতি উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে যতনা বেশি সমস্যাপূর্ণ, তার চেয়ে রাজস্ব ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশি সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি, ঋণ সমন্বয় করার পরও এ সমস্যা থেকে যাচ্ছে। ড. ভট্টাচার্য অর্থায়নকে আরেকটি উদ্বেগজনক দিক বলে অভিহিত করেন। ১৯৯০এর দশ কে যেখানে বিদেশি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা যেত, বর্তমানে তা ঘটছে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে। তিনি আরো বলেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ২৪ শতাংশ হলেও, এটা অর্থ ঘাটতির চার ভাগের এক ভাগ। স্পষ্টতই বিভিন্ন উপায়ে বেসরকারি খাতকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এর

একটি সংশিষ্টতা রয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য শুধুমাত্র অনুদান নয় ঋণের উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ। ড. ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেন যে, ব্যয় অভিক্ষেপসমূহ চালু রাখতে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক অর্থ প্রয়োজন হবে। তিনি নীট ১.৫ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার জন্য ২ বিলিয়ন ডলার দাবির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গত ২৫ বছরে দেশে কখনও ২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক অর্থের প্রবাহ ছিল না। তাই বৈদেশিক অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী। অতএব, প্রধান চ্যালেঞ্জ কেবল প্রয়োজনীয় রাজস্ব উদ্বৃত্ত সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৬,৫০০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২৬,০০০ কোটি টাকা) ও সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচির (২১,৬০০ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি।

খাতওয়ারী বরাদ্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষা ও ধর্ম খাতে বর্তমান অর্থবছরে সর্বোচ্চ (১৬.৩ শতাংশ) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যদিও এ বরাদ্দ ২০০৬০৭ অর্থ বছরে বরাদ্দের তুলনায় ২.৯ শতাংশ কম। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতকে একত্রীকরণ করে বরাদ্দের বিষয়টি কোনভাবেই বোধগম্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি উলেখ করেন, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষা খাতে যেখানে ২৪.২ শতাংশ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে সেখানে ধর্ম খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.২ শতাংশ। তাই ধর্ম খাতের সঙ্গে শিক্ষা খাতকে যুক্ত করে সর্বোচ্চ বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে না। সে কারণেই এ দুটি ভিন্ন খাতকে আলাদাভাবে বরাদ্দ দেওয়া বাঞ্চনীয় বলে তিনি উলেখ করেন। অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রধিকার দিয়ে গত বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ৩০.৭ শতাংশ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং তা একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলেই তিনি মনে করেন।

ড. ভট্টাচার্য থোক বরাদ্দের পরিমাণ উলেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনাকে এবারের বাজেট প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আনা তার মতে অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য ২৪০৬.৪৫ কোটি টাকার বিশেষ থোক বরাদ্দ স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়।

ড. ভট্টাচার্য এবারের বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য উলেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন এ বরাদ্দ সামনের নির্বাচনে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রস্তুতি পর্বের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে।

কর ও শুল্ক

ড. ভট্টাচার্য সিপিডি'র বাজেটপূর্ব সুপারিশমালার উলেখ করেন– যেখানে করযোগ্য আয়ের মাত্রা ১২০,০০০ টাকা থেকে ১৫০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই বাজেটে গৃহীত হয়েছে। এবারের বাজেটে গাড়ি, বাড়ি, জমি কেনার মধ্যদিয়ে পরোক্ষভাবে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ করা এবং অঘোষিত বৈধ আয়ের জন্য করের প্রচলিত হারের সঙ্গে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে কর প্রদানের ব্যবস্থাকে তিনি স্বাগত জানান। তবে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকারীরা যেন এই সুযোগ ব্যবহার না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব বলে তিনি মন্তব্য করেন। ক্রেডিট কার্ডের লেনদেনের ওপর অগ্রিম কর অব্যহতির বিষয়টি ভাল উদ্যোগ বলেও তিনি মনে করেন।

ড. ভট্টাচার্যের মতে, এবারের বাজেটের কর আরোপের ক্ষেত্রে আশাহত করার মতো বিষয় হলো, ১৫ শতাংশ রেয়াত দিয়ে অর্থাৎ ১০ শতাংশ হারে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওপর করারোপ। জ্ঞানচর্চার ওপরে এই ধরনের করারোপ শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। সংবাদ কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে নিউজপ্রিন্ট আমদানির ওপর বিদ্যমান

শুল্কহার ২৫ শতাংশ হতে ১৫ শতাংশ করার পাশাপাশি স্থানীয় নিউজপ্রিন্ট শিল্প বিকাশের জন্য কাঁচামাল আমদানিকে করমুক্ত রাখা হয়েছে, তাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন। বাজেটে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার উদ্যোগ হিসেবে শুল্ককরের স্তরসমূহের পুনর্বিণ্যাস আমদানি প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন হলো একটি জাতীয় স্বার্থের বিষয় এবং এর সমগ্র ব্যয় বরাদ্দের অর্থ আসা উচিত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, যাতে জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদেশি প্রভাব নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে। জনগণ যাতে অধিক নিশ্চিত হতে পারেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাতা দেশগুলোর চাপমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন, আর এ জন্যে নিজেদের অর্থে নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন।

সাধারণ রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজস্ব ব্যবস্থার বিষয়ে ড. ভট্টাচার্য শুল্ক এবং আপাত শুল্ক, অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ, শুল্ক ফলক পুনর্নির্ধারণ, সম্পুরক শুল্কের সমন্বয়, করযোগ্য আয়ের পুনপ্রকাশ, তালিকা বহির্ভূত মোবাইল কোম্পানি সমূহের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ, শূন্য শুল্কের উলেখযোগ্য হ্রাস (নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ব্যতিত), ভ্যাটএর বর্ধিত পরিমান এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সরলীকরণ এবং সংশোধন মূলক ব্যবস্থা যা বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, সেসব প্রস্তাবনার সম্ভাব্য অভিঘাত উলেখ করেন।

বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, শুল্কহার পুনর্গঠন করা হবে। পূর্ববর্তী হার ১২, ১৫ এবং ২৫ শতাংশ থেকে ১০, ১৫ এবং ২৫ শতাংশে পরিবর্তন করা হবে এবং ৪ শতাংশের অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ প্রত্যাহার করা হবে। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিপিডির হিসেবের বরাত দিয়ে বলেন, পূর্বে কাঁচামালের শুল্কহার ৫ থেকে ১০ শতাংশ ক্যাটাগরির মধ্যে ছিল। তাই ওসব কাঁচামালের কার্যকর শুল্কহার ২৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৯.৫ শতাংশে। অর্থাৎ কাঁচামালের ওপর শুল্কহার বাড়বে ১.৭৫ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের কার্যকর শুল্কহার ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১৫ শতাংশে, ফলে শুল্কহার ৩৫.৮ শতাংশ থেকে সামান্য কমে হবে ৩৫.২ শতাংশ। তিনি এই উদ্বেগের এখানেই শেষ নয় বলে উলেখ করেন, এছাড়াও সমস্যা রয়েছে উৎপাদিত পণ্যের শুল্কের ব্যাপারেও, যা ৫০.৭ শতাংশ থেকে ২৬.৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ড. ভট্টাচার্য ইঙ্গিত দেন, শুল্কের ওপর আপতিত পরিবর্তনের কারণে সংশিষ্ট শুল্ক অথবা কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যকার পার্থক্য ২৩ শতাংশ (সম্পুরক কর ছাড়া) থেকে হ্রাস পেয়ে ১৭.২ শতাংশ হবে। ফলশ্রুতিতে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদকরা যে সুরক্ষা ভোগ করে আসছিল তা প্রায় ৫ থেকে ৬ শতাংশে হ্রাস পাবে। ড. ভট্টাচার্য বলেন, তিনি নিশ্চিত নন এটা অভিপ্রেত ছিল কি না। তবে এর ব্যাপক একটা অংশ সম্পুরক কর প্রয়োগের মাধ্যমে পূরণীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ড. ভট্টাচার্য সরকারের প্রস্তাবিত সুরক্ষা করের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যেক্ষেত্রে অ্যান্টিডাম্পিং কর এবং সমতারক্ষাকারী (কাউন্টাভেইল) কর বিদ্যমান রয়েছে, সেক্ষেত্রে সুরক্ষা কর কতটা কার্যকর তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি উলেখ করেন, সুরক্ষা কর (সেফগার্ড ট্যাক্স) প্রবর্তন শুল্ক কাঠামোর স্বচ্ছতা আনয়নের প্রয়াসকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বলেন, যদিও তিনি শুল্ক বা ট্যারিফের একীভবন সমর্থন করেন, তবু শুল্ক কাঠামোর ছয় ডিজিট স্তরে প্রতি পদে পদে অনুসন্ধানের আহ্বান জানান এবং সেসব ক্যাটাগরির ওপর জোর দেন, যার ওপর সম্পুরক কর আরোপিত হয়েছে।

মূল্য স্থিতিকরণ ব্যবস্থা

ড. ভট্টাচার্য ২০০৭২০০৮ অর্থবছরে সরকারের জন্য পণ্যমূল্য বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাকে অন্যতম অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে উলেখ করেন। এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতিকে সহনশীল মাত্রায় রাখার জন্য সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর গবেষণা ও বিশেষণ অনুযায়ী তিন ধরনের

উদ্যোগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে– বাজার ভিত্তিক হস্তক্ষেপ, অবাজার ভিত্তিক পদক্ষেপ, এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং আমদানি খরচ হ্রাস, দক্ষ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিমাণ ও অংশ কমানোর মাধ্যমেও বাজারের মূল্যস্ফীতিকে সহনশীল করা সম্ভবপর হতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তাঁর মতে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে এবারের বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যপরিস্থিতি সহনশীল করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সিপিডির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের প্রতিফলন এবারের বাজেটে লক্ষ করা গেছে বলেও তিনি মনে করেন। তিনি বলেন সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি উৎসাহিত করতে চাল ও গমসহ বেশকিছু দ্রব্যের আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। এছাড়া ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ দিয়েছে যা বর্তমানের সংকুচিত আমদানি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে। তাঁর মতে বেসরকারি খাতের সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবেও আমদানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ মূল্যবৃদ্ধিকে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি ঢাকার চার প্রান্তে চারটি বাজার স্থাপনের উদ্যোগের কথা উলেখ করেন, যাতে বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করতে পারে। তার মতে নিম্নআয়ের জনসাধারণের জন্য বিডিআরের ডালভাত কর্মসূচিকে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় ও পরিবহণ খরচ হ্রাস, কৃষি খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি, বাজারের ব্যবসায়ীদের আস্থা পুনরুদ্ধার, বাজারে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের তালিকা প্রদর্শন, ডলার ও টাকার ক্রয়বি ক্রয়মূল্যের পার্থক্য হ্রাস, আসন্ন রমজানের মূল্যবৃদ্ধি রোধে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদে বাজার পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক রাখবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহকে শক্তিশালীকরণ, টিসিবির কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ণ, জাতীয় মজুদনীতির সংশোধন দীর্ঘমেয়াদে বাজার পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ড. ভট্টাচার্য আলোচনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধে প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হলো নিয়মিতভাবে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় মনিটরিং কমিটি গঠন, টিআর, জিআর, কাবিখা এবং ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনি কাঠামো গড়ে তোলা, ঢাকার চারপ্রান্তে চারটি পাইকারি বাজার স্থাপন এবং সরকারিভাবে ৮ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি ও অভ্যন্তরীণ খাত থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ। এছাড়াও বাজারমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ভোজ্য তেল ও মসুর ডালের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার এবং চাল, গম, পেঁয়াজ, মটর ডাল, ছোলার ডালসহ যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শুল্ক ইতিপূর্বে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার একটি প্রস্তাব তিনি তুলে ধরেন।

কর প্রশাসন সংস্কার

ড. ভট্টাচার্য মনে করেন যে, ভ্যাটের উদ্যোগের সাথে ভ্যাট সংযুক্ত এমআরপি (সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য) যুক্ত থাকা উচিত। তিনি রাজস্ব বোর্ডের একটি ডাটাবেজ তৈরি সহ বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) তৈরির পরামর্শ দেন।

তিনি 'ইউনিভার্সাল সেলফঅ্যাসেসমেন্ট' বা সর্বজনীন স্বনির্ধারণী আয়কর পদ্ধতি দ্রুত বাস্তবায়নের

জন্য আহ্বান জানান। করদাতা নাগরিকগণের স্বার্থে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। একই ভাবে ভ্যাট নিবন্ধন সহজ করা উচিত বলেও তিনি মনে করেন।

খাতভিত্তিক ব্যবস্থা

কৃষি

ড. ভট্টাচার্য পাওয়ার পাম্পের শুল্ক মুক্ত আমাদানি প্রত্যাহার এবং এতে ১০ শতাংশ করারোপের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি কৃষি সেচকার্যে ব্যবহার্য পাওয়ার পাম্পের শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগদানের পরামর্শ দেন।

ড. ভট্টাচার্য বলেন, ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে ৪৩৩২ কোটি (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) বরাদ্দ করা হয়েছে যা বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় (৩১৬১ কোটি) ৩৭ শতাংশ বেশি। তিনি আরও বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার, ডিজেল, সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষিখাতে ভর্তুকি হিসেবে ২২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ড. ভট্টাচার্য সিপিডির বাজেট বিষয়ক প্রস্তাবিত সুপারিশমালা উলেখ করে বলেন, এতে ডিজেলের ভর্তুকি কার্ডধারী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষকদের কাছে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে সার আমদানির ওপর শুল্ক মুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা একদিকে যেমন কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে অন্যদিকে কৃষিতে ব্যবহার্য পাম্পের ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলেও তিনি মনে করেন।

কৃষি উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য এবারের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে বলে ড. ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য বাজেটের উলেখিত প্রস্তাবগুলোকে তিনি প্রশংসনীয় বলে মনে করেন। অবশ্য প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নই তার মতে বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, বরাদ্দকৃত অর্থের বেশিরভাগ যথাযথভাবে খরচ হয় না। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৬ শতাংশ। ড. ভট্টাচার্য কৃষিক্ষেত্রের এই বাস্তবতা কৃষকের হতদরিদ্র চেহারার প্রতিচ্ছবি বলে মনে করেন। তিনি আশা করেন, প্রস্তাবিত বাজেটের সময়োপযোগী উদ্যোগগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং প্রকৃত অর্থেই কৃষকের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ

ড. ভট্টাচার্যের মতে, পোলট্রি শিল্পের বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য বাজেটে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার এভিয়ান ভাইরাস আক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ও বিপন নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছাড়াও ২০ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে তিনি স্বাগত জানান।

শিল্প

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিল্পখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৪১.৮ কোটি টাকা যা গত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় প্রায় ২৫ ভাগ কম, তবে এ বরাদ্দ গত বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির চেয়ে প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি। তিনি

আরও বলেন, এই অর্থবছরে শিল্পের ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় প্রকল্পের সংখ্যা কমেছে এবং নতুন কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিও ঘটেনি। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প স্থাপন করে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন। রপ্তানি খাতকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম স্টিল মিল এবং আদমজী পাটকলকে পুনর্গঠিত করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় রূপান্তরিত করার জন্য শিল্পে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়াকে ইতিবাচক দিক বলে তিনি মনে করেন। সার সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে জিয়া ও যমুনা সারকারখানাকে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন করে উৎপাদন বাড়ানো জন্য যে ৬৮ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তাকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

পোশাক ও বস্ত্র শিল্প

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, রপ্তানির প্রধান উৎস পোশাক শিল্পের প্রসারের জন্য ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৪টি প্রকল্পে ১০১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সাথে বস্ত্র শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ওপর শূন্য শুল্কের পরিবর্তে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করাকে আমাদের পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ড. ভট্টাচার্য বিস্ময় প্রকাশ করেন এই মর্মে যে, চলতি অর্থবছরের বাজেটে অবহেলিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ নেই, যেখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩২১ কোটি রুপি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

বাংলাদেশের মতো একটি শ্রমনিবিড় জনবহুল দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্দ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন তৈরির উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে ড. ভট্টাচার্য মনে করেন। এই শিল্পে মূলধন সংকট দূরীভূত করতে উক্ত ফান্ডে ১০০ কোটি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্কারে যে ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে তিনি স্বাগত জানান। এছাড়া কুটিরশিল্পে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের সীমা ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা বৃদ্ধিকেও তিনি সাধুবাদ জানাবার মতো পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও মাঝারি শিল্পগুলোর নিকট থেকে কর সংগ্রহ এবং ঋণ সহায়তার প্রক্রিয়া সহজতর করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আরও বিস্তার ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেশীয় শিল্প সুরক্ষা

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের জন্য এবারের বাজেটে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী এবং টেক্সটাইল যন্ত্রপাতির ওপর বিদ্যমান শূন্য শুল্কহার সুবিধা বিলোপ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য কম্পিউটারকে শুল্ক মুক্ত রেখে, সহযোগী যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক আরোপ করলে অভ্যন্তরীন উৎপাদন ব্যাহত হবে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অশোধিত চিনির ওপর বিদ্যমান নির্দিষ্ট শুল্ক টন প্রতি ২২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪০০০ টাকা নির্ধারণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা সরকারের একটি সুবিচক্ষণ পদক্ষেপ হিসেবেই তিনি বিবেচনা করছেন।

এবারের বাজেটে প্রস্তুত পণ্য ও কাঁচামালের ওপর ভিন্নভাবে করারোপের সুষমকরণ প্রক্রিয়াটি সার্বিক হলেও তা দেশজ শিল্পের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে বলে তিনি সতর্কবাণী উপস্থাপন করেন। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দ্রুততার সাথে পণ্যভিত্তিক বিশেষণ করে কর আরোপের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অবকাঠামো এবং বিদেশি বিনিয়োগ

বাজেটে বৃহৎ জাতীয় প্রকল্প সমূহ যেমন– পদ্মা সেতু, মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন, চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন, একটি নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন, যমুনা নদীর ওপর আরও একটি নতুন সেতু নির্মাণ, ঢাকার উন্নত সড়ক ব্যবস্থা, ঢাকাচ ট্টগ্রাম পরিকল্পিত এক্সপ্রেস হাইওয়েতে কোন বরাদ্দ না থাকায় ড. ভট্টাচার্য হতাশা প্রকাশ করেন। অনাবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) বিনিয়োগকারী ব্যতীত অন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনরকম বিশেষ প্রস্তাব না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজার উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, কতিপয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (এসওই)এর শেয়ার পুঁজি বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত এবং মোবাইল কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা (অতিরিক্ত কর আরোপ করার ভয় দেখানোর মাধ্যমে) ছাড়া এই বাজেটে উলেখযোগ্য কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত নয়। তবে ২০০৭০৮ অর্থ বছরে সরকার জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ খাতের একাধিক সরকারি এন্টারপ্রাইজকে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন সরকারি এন্টারপ্রাইজের কথা বাজেটে উলেখ করা হয়নি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

সরকার বয়স্কভাতা ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২০ টাকা করেছে। এই বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়ে ড. ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান বাজার অনুপাতে এটা আরও বিবেচনাপূর্ণ কাজ হতো যদি বৃদ্ধির পরিমাণ ২২০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা হতো। যদি তা করা না যায়, তাহলে ভিজিডি ও ভিজিএফএর মাধ্যমে এ সমস্যার মোকাবেলা করা উচিত বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

পরিবেশ

প্রস্তাবিত বাজেটে পরিবেশ উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন। পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প দূষণ রোধে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাকে প্রশংসনীয় বলে তিনি উলেখ করেন। একই সাথে সিপিডির সুপারিশ বিবেচনায় এনে যে সমস্ত শিল্প কারখানার মালিকরা বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করবে না তাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে ৩৫ শতাংশ হারে কর প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় মোবাইল অপারেটরগুলোকে ৪৫ শতাংশ হারে কর প্রদান করতে হবে। সিপিডির বাজেট পূর্ব সুপারিশমালায় নির্দিষ্ট এই সুপারিশটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখেছিল। এছাড়াও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ভিওআইপি ব্যবসাকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য নীতি প্রণয়নের ঘোষণা সরকারের রাজস্ব আয়কে উলেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বৈদেশিক সাহায্য

ড. ভট্টাচার্য বৈদেশিক সাহায্য বিশেষ করে পাইপ লাইনে থাকা ৬৭ বিলিয়ন ডলার দ্রুত ছাড় করার বিষয়ে টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি আইএমএফএর স ঙ্গে নতুন ঋণ চুক্তি করা নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, আইএমএফ 'ব্যালান্স অব পেমেন্ট'এ সমর্থ ন যোগায়, কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়ন সমর্থন যোগায় না। লেনদেনের ভারসাম্য (বিওপি) সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার কারণে, এই মুহূর্তে এরূপ চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই বলেই তিনি মন্তব্য করেন।

চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ

ড. ভট্টাচার্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন, যা ছাড়া বর্তমান অর্থবছরে সরকারের পক্ষে বড় ধরনের ব্যয়ের বাজেট খরচ করা কঠিন হবে। বিশেষ করে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্ব উলেখযোগ্য অবদান রাখবে। সামাজিক অবকাঠামো সমুহের ক্ষেত্রে তিনি সরকার ও এনজিওগুলোর অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। তিনি জ্বালানি খাতের দিকে নজর দেওয়া এবং বিদেশি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়ারও পরামর্শ দেন।

ড. ভট্টাচার্য দু'টো বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে তার বক্তব্য শেষ করেন। প্রথমত, পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) শক্তিশালী করণ এবং তা বাস্তবায়ন। এটা ব্যতীত বর্তমান উচ্চাভিলাষী বাজেট কাঙ্খিত মান অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা যাবে না। তিনি জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকেই পুরো প্রক্রিয়া দেখাশোনা করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবীক্ষণ কমিটি রাখার পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি উত্থাপন করেন। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক তথ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। তিনি লক্ষ্য করেন, বর্তমানে অর্থনৈতিক হিসাব এবং অভিক্ষেপ করা হয় তা অনুমান এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে। তিনি বর্তমানে সর্বশেষ প্রকৃত বিনিয়োগের তথ্য প্রাপ্তির সমস্যার কথাও উলেখ করেন, তা বেসরকারি খাতের শিল্প হোক অথবা সরকারি খাতের হোক। উৎপাদনমুখী খাত বেসরকারি বিনিয়োগের কোন বিশ্বস্ত পরিসংখ্যান নেই বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিসহ ভোক্তার খরচের হার, ইত্যাদি বিষয়ে ভালো এবং বিশ্বস্ত তথ্য ব্যতিত কেউ বলতে পারবে না গরিবদের জন্য কত টাকা ব্যয় হচ্ছে। তথ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া ছাড়া বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে না বলে তিনি উলেখ করেন। ড. ভট্টাচার্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে পুনর্গঠন, যথেষ্ট পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ ও লোকবল বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অর্থ উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানান।

মুক্ত আলোচনা

সরকারি ব্যয়: বাংলাদেশ ব্যাংকের মূখ্য অর্থনীতিবিদ ড. সৈয়দ মইনুল আহসান বলেন, রাজস্ব ব্যয় স্ফীতিপ্রবণ এবং তিনি রাজস্ব বাজেটের ব্যাপক বৃদ্ধির ব্যাপারে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেন। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের এডিপির প্রায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধিকে প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই তিনি মনে করেন।

সাবেক সাংসদ ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দূর্ভাগ্যক্রমে সরকারের দ্বারা অর্জিত অধিকাংশ রাজস্বই খরচ করা হয় রাজস্ব ব্যয়ে, উন্নয়নের জন্য নয়। তিনি বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যয়ের আধিক্যের কারণ বের করার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তিনি যথাযথরূপে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ওপর জোর দেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন, বর্তমান সরকারই তা বাস্তবায়নে সফল হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠানই রয়েছে, যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লোকবল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ পলী-

উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)এর কথা উ লেখ করে বলেন বিআরডিবির লোকবল অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন– কৃষি মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং অন্যান্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তুলনায় বেশি কিন্তু বিআরডিবির কার্যকর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করার মাধ্যমে রাজস্ব ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন।

বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়ন

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক মনে করেন, অতীতের বছরগুলোর বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪ শতাংশের মধ্যেই ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপির ৫.৬ শতাংশ ঘাটতিকে উদ্বেগজনক হিসেবে দেখেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন, এই বিপুল ঘাটতির অর্থায়নে শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে ব্যাংক থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

অর্থায়নের বিষয়টাকে অত্যন্ত জটিল বলে আখ্যায়িত করে ড. মইনুল আহসান ২০০৭২০০৮ অর্থবছরের নিট বৈদেশিক অর্থায়নের প্রায় ৯০ কোটি ডলারকে, অতীতের বিবেচনায় ব্যতিক্রম কিছু নয় বলে মনে করেন। মোট বৈদেশিক অর্থায়নের চাহিদা ছিল ১.৫ বিলিয়ন ডলারের সমান– যা গত কয়েক বছরের অগ্রগতির বিবেচনায় অস্বাভাবিক নয়।

জনাব মইনুল আহসান আরও বলেন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ইস্যুতে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি। বিপিসির দায় যোগ করলে সামগ্রিক তারল্যের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াবে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে সরকার গত দুইতিন বছর ধ রে ৬০ বিলিয়ন টাকা নিচ্ছে। সুতরাং ৬০ বিলিয়ন টাকা থেকে এক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ বিলিয়ন টাকা হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের একটা প্রভাব পড়বে আর এটাই স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করেন।

সাবেক অর্থ সচিব ড. মশিহুর রহমান ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেট উচ্চ ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রণীত বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু এই উচ্চ ব্যয় যদি ধারের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয় তাহলে সুদের হারের ওপর চাপ পড়বে। এটা প্রবৃদ্ধির মূল যন্ত্র হিসেবে পরিচিত বেসরকারি খাতের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

ড. মশিহুর রহমান বিপিসি বন্ডের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তিনি বলেন, অতীতে সরকার বন্ড ইস্যু করেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন নগদ লেনদেন ছিল না। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে বন্ডধারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার সুদ প্রদান করে। অবশ্য এটা যদি ব্যাংকগুলোতে প্রদান করা হতো, তাহলে এর এসএলআর (স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও), এর যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো। যদিও বাজেটের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রস্তাবনা ঠিক থাকলেও এসএলআরএর কিছুটা স্ফীতিমূলক প্রভাব থেকেই যায়।

সাধারণ অর্থ ব্যবস্থা

এফবিসিসিআইএর চেয়ারম্যান মীর নাসির আমদানি শুল্কের ওপরে নির্ভরতা কমিয়ে প্রত্যক্ষ কর ও ভ্যাটের ওপর জোর দেন। কর কাঠামোর ব্যাপারে তিনি দু'টো প্রস্তাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। এর একটা হলো, সর্বনিম্ন স্তর ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে বৃদ্ধি করা এবং অপরটি, আইডিএসসি প্রত্যাহার করা। মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্যের ওপর এর একটা প্রভাব পড়বে, কারণ, বস্ত্র এবং পাট শিল্পের সব আইটেমের জন্য ৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি থাকলেও বর্তমানে তা শূন্য থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। ফলে বেসরকারি খাতের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকছে।

গুঁড়ো দুধের ওপর বর্ধিত শুল্কের সমালোচনা করে ডেমোক্রেসি ওয়াচের মিসেস তালেয়া রহমান বলেন শিশুখাদ্যকে ব্যয়বহুল করা উচিত নয়।

মূল্যস্ফীতি

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে বড় সমস্যা উলেখ করে একে রোধ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিপনন শৃংখলা (চেইন)এর অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায়ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে বলে তিনি মনে করেন। যেহেতু বিপনন ব্যবস্থা নিতান্তই বেসরকারি খাত পরিচালিত কার্যক্রম সেক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবসায়ী ও বণিকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাজেটে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনুবিধিকে স্বাগত জানিয়ে ড. ফারুক কৃষি গবেষণার জন্য বিশেষ তহবিল (এনডাউমেন্ট ফান্ড)এর প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, এটা যথার্থ উপায়ে বাস্তবায়িত করা যাবে। সয়াবিন তেলের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকির ব্যাপারে তিনি আশঙ্কা করেন যে, সয়াবিনের ওপর ভর্তুকি দিয়ে সরকার ৩০০ কোটি টাকার রাজস্ব হারাতে পারে। কিন্তু যদি ভারতের সীমান্তে সয়াবিন ও অন্যান্য ভোজ্য তেলের মূল্যের চেয়ে বাংলাদেশের মূল্যস্তর কম হয় তবে অধিকাংশ ভোক্তারা এর সুফল পাবে না। সারের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক ভর্তুকি দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানান ড. ফারুক। কেননা ভারতের সাথে মূল্যের পার্থক্যের কারণে সীমান্তে কালোবাজারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মূল্যস্ফীতির ব্যাপারে সাবেক কৃষি মন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার উলেখ করেন, ডাল ও ভোজ্যতেলের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও বাজারে ডালের দাম ৫ থেকে ৬ টাকা এবং ভোজ্য তেল ২ টাকা বেড়ে গেছে। এমন কি, চিনির দামের ক্ষেত্রেও (যা ১ জুলাইয়ের আগে দাম বাড়ার কোন কথা নয়) অগ্রিম ৪ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তিনি শুল্ক হ্রাস সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ছে তার মৌলিক কারণ বিশেষনের পরামর্শ দেন। সরবরাহ ব্যবস্থায় কোন সমস্যা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। তিনি উলেখ করেন, আগত বছরের জন্য মুল্যস্ফীতি টার্গেট করা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। কিন্তু শুরুতেই শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকলে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ পেরিয়ে যেতে পারে।

রাজনীতিবিদ জনাব রাশেদ খান মেনন উলেখ করেন, বাজার সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাজারের ওপর। এক্ষেত্রে তিনি বাজার নিয়ন্ত্রণে কিছু আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিপিডির প্রস্তাবের কথা উলেখ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বাজেটে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো, কিছু আর্থিক ব্যবস্থা এবং শুল্ক হ্রাসের উদ্যোগ। কিন্তু এর কোনটারই বাজারের ওপর ইতিবাচক প্রভাব নেই। তিনি আরও উলেখ করেন, অর্থনীতিবিদরা নয়, বাজারের উন্নতির তদন্ত এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবনা তৈরি করছে বিডিআর। তিনি এই বিতরণ চ্যানেলগুলোকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার ওপর জোর দেন। এই ব্যাপারে এখনই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কারণ বর্তমান উচ্চ মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভোক্তা সাধারণের প্রকৃত আয় মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি স্বল্প বেতনের সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা চালু করার সিপিডির প্রস্তাবকে সমর্থন জানান।

সাবেক সাংসদ ড. রাজ্জাক কৃষির ওপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করার জন্য কিছু উন্নত দেশ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিয়ত চাপের প্রতিবাদ জানান। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ যাতে উন্নত দেশ থেকে আমদানি করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ক্ষেত্রে এসব উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্য করা উচিত, কেননা বাংলাদেশ একটা স্থায়ী ঘাটতির দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

বেঁধে দেওয়া উচিত, যা তাদেরকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন, সুশাসন এবং দেশে যে প্রযুক্তি রয়েছে তা দিয়েই মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন সম্ভব।

সাবেক বাণিজ্য সচিব জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী ঢাকা মহানগরীর সঙ্গে যুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মহানগরীতে বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাসের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, ঢাকা মহানগরীতে আরও ৬ থেকে ৮টা আড়ৎ প্রতিষ্ঠার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি এই ইস্যুকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনার ওপর জোর দেন। যা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আগাম পরিকল্পনার বিষয়েও জোর দেন, যাতে যে কোন রকম বাহ্যিক আঘাত যেমন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহে কোনরূপ উৎপাদন ঘাটতি দেখা দিলে, যেন বাংলাদেশের পণ্যমূল্যের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

কৃষকদের সমবায় সম্পর্কে জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরি মনে করেন যে, বৃহদাকার চুক্তিবদ্ধ খামারের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির মোকাবেলা করা সম্ভব।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), এর মাধ্যমে আমদানির ব্যাপারে তিনি বলেন, বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির আধিপত্য থাকায় ১৯৭০ এর দশকের মতো টিসিবি এখন আর তেমন কার্যকর বলে বিবেচিত হতে পারছে না। বরং টিসিবিকে শক্তিশালী করে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত করলে আমদানির ক্ষেত্রে আরও কম সময়ের প্রয়োজন হবে।

বর্তমান মুল্যস্ফীতিজনিত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে আইএমএফএর মি. জোনাথন ডোন বলেন, আর্থিক এবং রাজস্বনীতির মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই সুদের হার বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন, যদিও এতে বাজেটের জন্য ঋণ খরচ বেড়ে যেতে পারে।

কৃষি

কৃষিতে ভর্তুকি কাঠমো ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করে সাবেক কৃষি মন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার বলেন, ডিজেল চালিত পাম্পের সেচ খরচ বিদ্যুতের খরচের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি। সুতরাং ডিজেলের ভর্তুকি হিসেবে ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া পাম্প চালাতে ডিজেল ও বিদ্যুতের জন্য একইরকম মূল্যকাঠা মো তৈরিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফান্ড প্রয়োজন হবে এবং গঠন কাঠামো পর্যালোচনারও প্রয়োজন পড়বে।

সেচ পাম্প আমদানির ওপর করারোপ প্রত্যাহার করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন জনাব এম কে আনোয়ার। কৃষি গবেষণার জন্য ৩৫০ কোটি টাকা এনডাউমেন্ট ফান্ড সৃষ্টিকে একটা ইতিবাচক উদ্যোগ বলেও তিনি অভিহিত করেন। তাঁর মতে এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে দেওয়া উচিত। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য এডিপির বরাদ্দ ১২২১ কোটি টাকা কমিয়ে কেন ৮৩৮ কোটি টাকা করা হলো তার ব্যাখ্যা দাবি করেন।

কৃষি খাতে পাওয়ার পাম্পের ওপর আমদানি শুল্ক সম্পর্কে রাজনীতিবিদ জনাব জি এম কাদের ১০ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে শূন্য শতাংশ করা উচিত বলে মনে করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, কৃষিখাত জিডিপিতে উলেখযোগ্য অবদান রাখলেও কৃষকরা তাদের যথাযথ স্বীকৃতি পায় না।

জনাব কাদের ডিজেলের ভর্তুকি সরাসরি কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তবে, কৃষকের কাছে কোন পদ্ধতিতে এই ভর্তুকি দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাবের কথা জানান। তিনি সতর্ক করে দেন, এই ভর্তুকি প্রদান বা বিতরনের ক্ষেত্রে যদি কোন কার্যকর পদ্ধতি না থাকে তাহলে বরাদ্দকৃত ফান্ডের অপচয় হবে, যা ইতিপূর্বে অনেক ভর্তুকির ক্ষেত্রে ঘটেছে।

মেট্রোপলিটন চেম্বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কেদারপুর টি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস লায়লা রহমান কবির, বাজেটে কৃষির ওপর গুরুত্বারোপ দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত বিষয়

বলে উলেখ করেন। তিনি কৃষির সমর্থনপুষ্ট বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কৃষিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত। তার মতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস অর্থনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়।

মিসেস কবির চা বাগানে সার বিতরণের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কৃষিকে উৎপাদনশীল করতে হলে সার অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে উৎপাদকদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। তিনি চা খাতে বর্তমানে ১২ হাজার টন সারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং এর সবটুকুই যেন জুন ও জুলাই মাসের মধ্যেই কৃষকের কাছে সরবরাহ করা হয় তার নিশ্চয়তার আহ্বান জানান। কিন্তু এযাবৎ মাত্র ২৫০০ টন সার সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বহু চাপাচাপির পর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, আরও ২৫০০ টন সার পাওয়া যাবে, কিন্তু তার মূল্য হবে ৬ গুণ বেশি। অর্থাৎ প্রতি টন ৪৮০০ টাকা থেকে বেড়ে ২৮০০০ টাকা হয়েছে। সাধারণত ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে সার সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, সরবরাহকৃত সার সংগ্রহ করতে হবে উত্তরবঙ্গ থেকে। মিসেস কবির উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এই সকল প্রক্রিয়ার ফলে এ বছর সারের জন্য দরখাস্ত দেওয়ার সময় প্রায় শেষ দিকে এসে গেছে। তিনি যুক্তি দেখান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সারের সঠিক পরিমাণ এবং যথাসময়ে উৎপাদকদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী চা উৎপাদনে সারের ওপর ভর্তুকি প্রদানের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, চা শিল্প ভাল মুনাফা করছে এবং এতে নতুন ভর্তুকি দেওয়া ঠিক হবে না।

ড. রাজ্জাক উলেখ করেন যে, ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে কৃষি খাতে উলেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি পণ্য খাতে গড়ে ৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কৃষিকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কৃষিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বনির্ভর দেশে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তিনি ডিজেলে ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। শস্যখাতের পাশাপাশি পশুপালন খাত উন্নয়নের জন্যও গুরুত্ব নেওয়া দরকার। পশুপালন খাতের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অতীতে পশুপালন খাতকে বাজেটে অবজ্ঞা করা হয়েছে বলেও তিনি উলেখ করেন।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন

জনাব মীর নাসির গুকোজের ওপর থেকে ১৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করায় দেশীয় শিল্পের ওপর এর একটা প্রভাব পড়তে পারে। বস্ত্র শিল্পের পশ্চাদসংযোগ শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন নিট ওয়্যারএর ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও ওভেন সেক্টরের অর্জন তেমন সন্তোষজনক।

জনাব নাসির বিগত বাজেটগুলোতে রুগ্ন শিল্পে বরাদ্দ প্রদানের কথা স্মরণ করে বলেন, ২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটে সেরকম কোন বরাদ্দ নেই। এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

জনাব এম কে আনোয়ার মন্তব্য করেন যে, একটা আমদানিবান্ধব করনীতি অভ্যন্তরীণ শিল্পের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করবে। চাপ এড়ানো সম্ভব হলে এতে জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হবে। শুল্কহার ৫ শতাংশ হ্রাস করা হলেও লক্ষ রাখতে হবে যেন সার্বিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। সুরক্ষা বা সংরক্ষণ ছাড়া শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেতে পারে এবং পরিণামে জিডিপির ওপর তা বিরূপ ফলাফল বয়ে আনতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

মেট্রোপলিটন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট জনাব লতিফুর রহমান বলেন যে, বাজেটে কাঁচামাল ও মধ্যমশ্রেণীর পণ্যের আমাদানির চেয়ে উৎপাদিত পণ্য আমদানির পক্ষপাতি। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল এবং মধ্যমশ্রেণীর পণ্য। উৎপাদিত পণ্যের আমদানি যখন ঘটে তখন সাময়িক সময়ের জন্য কাস্টমস শুল্ক বেড়ে যেতে পারে, আর সেক্ষেত্রে ভ্যাটের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই দেশকে স্থানীয় শিল্প সম্প্রসারণ করতে হবে। এর জন্য নীতি নির্ধারণ করা

প্রয়োজন, যাতে কাঁচামাল আমদানিতে বাধা না আসে। বাজেট সেই ধরনের আমদানির সহায়ক হওয়া খুবই জরুরি।

বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুলাহ আল মাহমুদ উলেখ করেন যে, নিউজ প্রিন্টের ওপর থেকে আমাদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই সেক্টরে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ রয়েছে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা এবং এখনও নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে। এই সেক্টরের আমাদানি শুল্ক হ্রাসের কারণে অভ্যন্তরীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মারাত্মক ফল বয়ে আনতে পারে। এমতাবস্থায় তিনি পূর্বতন শুল্ক কাঠামো পুনর্প্রবর্তনের যুক্তি দেখান।

তৈরি পোশাক শিল্প

পলী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসেস পারভিন মাহমুদ উলেখ করেন, তৈরি পোশাক খাতের সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং ছাঁটাই কর্মীদের সহায়তার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ড ফান্ডের বিষয়ে সিপিডির প্রস্তাব বাস্তবসম্মত মঙ্গা পীড়িত এলাকায় মিনি গার্মেন্টস স্থাপনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন যে, এর ফলে মঙ্গা পীড়িত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তৈরি পোশাক খাত সম্পর্কে বিজিএমইএএর প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ারুল আজম চৌধুরী বলেন যে, এদেশে সুদের হার খুব বেশি। সুদের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে না আনলে এই খাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা খুব কঠিন হবে। বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং লোডশেডিং এর ফলে তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন ঠিক সময়ে ডেলিভারিও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করছে। ৬ থেকে ৭ বছরের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়াস থাকা উচিত, কিন্তু বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই। তৈরি পোশাক খাতে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ শ্রমিক ঘাটতি রয়েছে। বাজেটে তৈরি পোশাক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দকৃত ২০ কোটি টাকা এই খাতের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। বাজেটে শুল্ক প্রক্রিয়া সহজ করার প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করে জনাব চৌধুরী বলেন যে, এই সেক্টরে ট্যাক্স হলিডের সুবিধা এবং নিম্নতম সুদের হার ৭ শতাংশের সফট লোন সুবিধা অতি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি বস্ত্রখাতের উন্নয়নের ওপরেও বিশেষ জোর দেন, যেহেতু– বস্ত্রখাত হলো তৈরি পোশাক খাতের জন্য পশ্চাদসংযোগ শিল্প। বস্ত্রখাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য টেক্সটাইল মেশিনারিজের ওপর ভর্তুকি দেওয়া দরকার।

পাক্ষিক অনন্যা সম্পাদক মিসেস তাসমিমা হোসেন উলেখ করেন যে, বাজেটে তৈরি পোশাক খাতের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ইস্যুতে কোন প্রতিফলন নেই। তিনি বস্ত্রখাতের শূন্য শুল্ক প্রত্যাহারের কথা উলেখ করেন। তিনি মনে করেন এই খাতে অতীতের মত 'ক্যাশ ইনসেনটিভ' সুবিধা দেওয়া উচিত। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, রপ্তানিতে যারা ভাল অবদান রাখছে, তাদের জন্য স্বল্প সুদের হার অথবা জ্বালানি সরবরাহ ভর্তুকির আকারে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী মনে করেন, সরকার শ্রমিক দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, কিন্তু তিনি সরকারের কন্ট্রিবিউশনসহ তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের প্রভিডেন্ড ফান্ড গড়ে তোলাকে সমর্থন করেন না। তার মতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শ্রমিক কল্যাণ দু'টোকে আলাদা রাখা উচিত।

পাট

সাবেক সাংসদ জনাব জিএম কাদের এর মতে ঐতিহ্যগতভাবেই উত্তরবঙ্গের মানুষ পাটের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। এখনও তেমনটাই রয়ে গেছে। তবে এটা বোধগম্য নয় কেন এই খাত বাজেটে গুরুত্ব পায় না, বিশেষ করে যখন ভারতের মতো প্রতিবেশি দেশে পাটশিল্প দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি পাটখাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অর্থ উপদেষ্টার কাছে দাবী জানান।

রাজনীতিবিদ জনাব রাশেদ খান মেনন ক্ষোভের সাথে উলেখ করেন যে, পাট খাত যখন দেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হতে পারে, ঠিক সেই মুহূর্তে গোটা বাজেটের কোথাও এ খাতের কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু পাট খাত এক অনিশ্চিত সময় পার করছে, এবং পাট প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে এই খাতকে আরো লাভজনক করার জন্য নতুন নতুন সুযোগ এখনও রয়ে গেছে।

উদারীকরণ

আইএমএফএর আবাসিক প্র তিনিধি জনাব জোনাথন ডান এর মতে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে আগের সময়ের চেয়ে বেশি সংরক্ষণশীল বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে। ১৫ শতাংশের সম্পুরক শুল্ক বেড়ে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশে, যা বিপুল সংখ্যক পণ্যকে আওতায় নিয়ে আসবে। যদি সেফগার্ড ট্যাক্স বা সুরক্ষা শুল্ক অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সংরক্ষণ প্রসারিত হতে পারে। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকা প্রয়োজন, আর এজন্য সংরক্ষণশীল নীতি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সহায়ক হবে না।

কর্মসংস্থান

মিসেস পারভিন মাহমুদ মনে করেন যে, বাজেট আত্মকর্মসংস্থান ও মজুরি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রণীত, যা এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিআইসি ট্রাস্ট, বর্তমান মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ এবং এগ্রিকালচার ইকুইটি এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ফান্ডে বরাদ্দের মাধ্যমেই প্রতিফলিত। বীমা পলিসির সংস্কারেও এর প্রতিফলন রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি মাইক্রোইনসু্যরেন্স এবং কৃষি বীমার ওপর গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

পথশিশু পুনর্বাসনকে ঢাকা মহানগরীর একটি প্রধান সমস্যারূপে আখ্যায়িত করে সাবেক সচিব জনাব শাহ হান্নান এই উদ্দ্যেশে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের এবং এর দায়িত্ব ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওপর প্রদান করার পরামর্শ দেন। তিনি অন্যান্য প্রধান শহরগুলোতেও এইরূপ কর্মসুচি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

জনাব হান্নান নদী ভাঙ্গন সমস্যার কথাও উলেখ করেন। তিনি বলেন, এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কোন সংস্থা নেই। এই সমস্যা সমাধানে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া দরকার এবং যতদিন স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারের কোন সংস্থা গঠিত না হবে, ততদিন এইরূপ বরাদ্দ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি এর দায়িত্ব বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিআরসিএস)এর ওপর অর্পণেরও পরামর্শ দেন।

জেন্ডার বৈষম্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাহমুদা ইসলাম উলেখ করেন যে, নারী উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিষ্কার ভূমিকা রাখতে হবে এবং তা নারীদেরকে মূলধারায় আনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই। খাতওয়ারি বরাদ্দ জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য বা জেন্ডার অসাম্য মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। খাতওয়ারী হিসেবে বাজেটে বরাদ্দ রাখার জন্য আহ্বান জানান।

ধর্ম এবং শিক্ষা

শিক্ষাবিদ ড. শাহেদা ওবায়েদ বলেন যে যদিও শিক্ষা প্রকল্পগুলোতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকে কিন্তু তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় না। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষত ঢাকার বাইরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে এটাকে একটা বড় সমস্যা বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ঢাকার বাইরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিপিডির বিশেষণের কথা উলেখ করে জনাব হান্নান উলেখ করেন যে, ধর্ম এবং শিক্ষাকে এক সাথে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। সিপিডি এ বিষয়টিকেই 'বোধগম্য নয়' বলে আখ্যায়িত করেছে। জনাব হান্নান মন্তব্য করেন যে, এ মন্ত্রণালয় পৃথক এবং তাদের হিসেবও পৃথকভাবে রাখা হয়। সুবিধাজনক করার জন্য হিসেব রক্ষার উদ্দেশ্যে ৬০টির মতো মন্ত্রণালয়কে একত্রে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে।

জ্বালানি

সাবেক কৃষি মন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার জ্বালানি খাতে অতিরিক্ত ২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দকে অপর্যাপ্ত বলে আখ্যায়িত করে এই সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার প্রস্তাব করেন।

তথ্য প্রযুক্তি (আই সি টি)

মিসেস তালেয়া রহমান কম্পিউটারের ওপর প্রস্তাবিত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানান। পরিবর্ধনশীল আইসিটি খাত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে এর ফলে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। অথচ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জনাব জি এম কাদের মনে করেন, দেশের জন্য এই খাতের আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা এবং এই খাতের উচ্চমানের কর্মসংস্থানের কথা মনে রেখে আইসিটি খাতের অব্যাহত সমর্থন নিশ্চিত হওয়া উচিত। তিনি কম্পিউটারের শূন্য শুল্ক অব্যাহত রাখার পক্ষে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন।

শিক্ষাবিদ ড. শাহেদা ওবায়েদ মনে করেন, দেশের 'প্রতিটি ছাত্রের জন্য একটা কম্পিউটার' এই ধারণা খুবই ভাল। কিন্তু যতদিন সেটা বাস্তবায়িত না হচ্ছে ততদিন কম্পিউটারের ওপর করারোপ না করার প্রস্তাব করেন, যাতে তুলনামূলক কম দামে মানুষ কম্পিউটার পেতে পারে।

ঋণের স্থায়ীত্ব

বাংলাদেশের ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল আহসান মন্তব্য করেন যে, ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বাজেটে ঋণের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি। বাংলাদেশের ঋণ জিডিপির অর্ধেকের বেশির সমান (প্রায় ৫১ শতাংশ)। যদি নিট ঘাটতি ৪.৫ শতাংশ যোগ করা হয়, তাহলে, এটা দাঁড়াবে ৫৫ থেকে ৫৬ শতাংশে, যা এই অঞ্চলে সর্বনিম্ন। দক্ষিণ এশিয়ার সব প্রধান দেশেরই উচ্চতর ঋণ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষণে দেখা যায়, দীর্ঘমেয়াদে ঋণ স্থায়ীত্ব বাংলাদেশের জন্য কোন ইস্যু নয়। যতদিন বাজেট পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা যাবে ততদিন এটা কোন বড় সমস্যা নয়। জনাব আহসান উলেখ করেন যে, এই স্বল্প ঋণের অর্থায়ন ব্যয় খুব বেশি। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ব্যয় বাংলাদেশে ব্যতিক্রমীভাবেই খুব বেশি।

বাজেটের বৈধতা

সাবেক সচিব ড. মশিহুর রহমান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে

বাজেটের বৈধতার ব্যাপারে সাংবিধানিক কোন বিষয় নেই। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যেই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাজেটের কথা বলা আছে এবং তা সংবিধানের ৮৭ এবং ৯০ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই দুই অনুচ্ছেদের আওতায় বার্ষিক হিসাবনিকাশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে হবে।

স্বচ্ছতা

ড. মশিহুর রহমান বলেন, বাজেট সেনাবাহিনীর জন্য কোন বরাদ্দ দেখায় না। ডিফেন্স প্রতিস্থাপনাসমূহের জন্য বরাদ্দ রয়েছে, কিন্তু নৌবাহিনীর জন্য, সেনাবাহিনীর জন্য, বিমানবাহিনীর জন্য কিছু নেই। এ বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দে অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ প্রদর্শন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, কৃষি ভর্তুকিতে মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা খাতওয়ারী বাজেটের ভর্তুকির ব্যয়ের বিষয়ে কিছু উলেখ নেই। প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যয়ের জন্য একই রকম বাজেট ধার্য রয়েছে। যেহেতু তাদের উভয়ের মধ্যে সাংবিধানিক অধিকার একেবারেই ভিন্ন, সুতরাং বাজেটে তাঁদের ব্যয় খাত পৃথক হওয়া উচিত এবং পৃথক বলে গণ্য হওয়া উচিত বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

অবৈধ অর্থ উদ্ধার

জনাব মইনুল আহসান পরামর্শ দেন যে, কাঠামোগত রাজস্ব অকাঠা মোগত রাজস্ব থেকে পৃথক হতে হবে। খারাপ কর অথবা কালো টাকা যাই হোক, সমস্ত অতিরিক্ত অর্থ জমা হচ্ছে ব্যাংকে, যা ইতিমধ্যেই ৬০০ কোটি জমা হয়েছে এবং এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এগুলো রাজস্ব বাজেটের মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ এগুলো কাঠামোগত নয়। এগুলো যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে তা সঠিক কাজ হবে না এবং নিম্ন ঘাটতিও যদি দেখানো হয়, তাও ঠিক হ বে না। স্বচ্ছতার খাতিরে একে পৃথকভাবে দেখানো উচিত। তিনি অনুরোধ করেন যে, এই অনিয়মিত আয় বা বাহ্যিক রাজস্ব রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠান (এসওই) পূর্নগঠন বিশেষত, বিপিসি বন্ড ইস্যুর মতো বাহ্যিক ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। তিনি অন্যান্য এসওইএর পুনর্গঠনের সাথে সম্পৃক্ত সম্ভাব্য ব্যয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনার অনুপাস্থিতির কথা উলেখ করেন, যেমন– বাজেটে জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এনসিবি)।

ড. মশিহুর রহমান বলেন, একটা বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত না করা পর্যন্ত উদ্ধারকৃত অবৈধ অর্থ রাজস্ব হিসেবে পরিগণিত হবে না। তিনি ড. মইনুল আহসানের সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে, সরকার যদি একে স্বাভাবিক অর্থরূপে ব্যবহার করে, তাহলে এর সাথে দুর্নীতির ছোঁয়া থাকবে। কাঠামোগত রাজস্ব থেকে একে পৃথক রাখা উচিত এবং কিছু কিছু খাতে এগুলো ব্যবহার করা উচিত, যেখানে প্রচুর ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন এবং সেই সাথে বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গরিব জনগণের রিলিফ ইত্যাদি খাতেও ব্যবহার করা দরকার। তিনি পরামর্শ দেন যে, যে বছরে এগুলো সংগৃহীত হবে, সে বছরে এই ফান্ড ব্যয় করা উচিত হবে না। ব্যয় স্তরে স্থিতি আনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এটা ব্যয় করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বাস্তবায়ন

বাজেটকে খুব বড় বলে আখ্যায়িত করে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন যে, এই ধরনের বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে বড় রকমের প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। তিনি দশজন উপদেষ্টার কাঁধে যে বড় দায়িত্ব বর্তেছে, তা সঠিকভাবে পালনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রত্যেক উপদেষ্টার কাঁধে কয়েকটি করে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব চেপেছে। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

জনাব মইনুল আহসান মনে করেন, এইরূপ বিশাল বাজেট বাস্তবায়নে দেশে এই মুহূর্তে যে শাসন কাঠামো রয়েছে তারচেয়েও বেশি বিকেন্দ্রীকৃত শাসন কাঠামো প্রয়োজন।

রয়াল নেদারল্যান্ড দূতাবাসের মি. নিলস ভিনিস পার্টনার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মারাত্মক দক্ষ ও প্রয়োজনীয় লোকবলের ঘাটতির উলেখ করেন, যা দাতাদের পক্ষে ব্যয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পক্ষে যথেষ্ট লোকবল একেবারেই নেই। এই ক্ষেত্রে তিনি পানিসম্পদ খাতের অবস্থার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

মি. জোনাথন ডান বলেন যে, বাজেট উচ্চাভিলাষী হলেও তা অর্জনের অসাধ্য নয়। যদি বাজেট বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে অভ্যন্তরীণ অর্থের দ্বারা ওই অর্থের বিকল্প না করা খুব জরুরি। বর্তমান মূল্যস্ফীতির চাপের কথা মাথায় রাখার কথা তিনি বলেন। গরিবদের লক্ষ্যে যা নয়, তার ওপর ভর্তুকি হ্রাস করা লক্ষ্য অর্জনের একটা পথ হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মি. নিলস ভিনিস প্রকল্প বাস্তবায়নে কাঠামোগত দৃঢ়তার কথা উলেখ করেন। তিনি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফর্মা (ডিপিপি) মূলনীতির কথা উলেখ করেন, যা একটা প্রকল্পের শুরুতেই প্রণয়ন করতে হয়। যদি কোন প্রকল্প ৭ বছর সময় পর্যন্ত চালাতে হয়, তাহলে এই ডিপিপি মাত্র দু'বার পরিবর্তন করা যায়। প্রকল্পের প্রারম্ভেই একটা প্রকল্প অনুমোদন করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগে যায়। একটি প্রকল্প চলার সমস্ত সময়ের মধ্যে মাত্র একবার আর্থিক বরাদ্দ সমন্বয় করার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা একটা বিশেষ উপায়ে একটা প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ, জ্বালানির দামে যদি কোন বৃদ্ধি থাকে অথবা কংক্রিট কিংবা কোন অবকাঠামোর জন্য কোন মেটালের দামে বৃদ্ধি থাকে, অথবা মজুরি বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রকল্প শুরু করা যাবে না যতদিন টেন্ডার আহবান করা না হচ্ছে। কারণ, সমগ্র ব্যয় ডিপিপি অনুযায়ী নয়। তিনি এই ক্ষেত্রে মাননীয় উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব এম কে আনোয়ার বলেন, বাজেট কিছুটা উচ্চাভিলাষী কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল। তিনি উলেখ করেন গত বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে এই বাজেট ৩০ শতাংশ বৃহদাকারের। এমন কি, বিপিসিকে বাদ দিলে বাজেট ৯ শতাংশ বেড়ে গেছে। মুনাফা প্রদানের সাথে সংশিষ্ট ব্যয় বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকারের শক্তিশালী প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে।

ড. শাহেদা ওবায়েদ বলেন, সংশিষ্ট লোকজনের বদলির কারণে বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা কনসালট্যান্ট প্রকল্প চালু অবস্থার মাঝামাঝি সময়ে যখন বদলি হয়, তখন প্রকল্প দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহম্মেদ-এর প্রতিক্রিয়া

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ অভ্যন্তরীণ ধার বা ঋণ নিয়ে উদ্বেগের ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করার ফলে বেসরকারি খাতের ঋণ সুবিধা সংকুচিত হচ্ছে কিনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা পর্যবেক্ষণ করছে। গত অর্থ বছরে সরকারের ঋণ নেওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি খাতের ঋণ গ্রহণ কমে যায়নি, বরং তা ১৬ শতাংশেরও বেশি হারে বেড়েছে।

ব্যাপক অর্থের প্রবৃদ্ধি, যা মুদ্রাস্ফীতির দিকে চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান যে, কয়েক বছর আগেও এই প্রবৃদ্ধি ছিল ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। সুতরাং এক্ষেত্রে বর্তমান প্রবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিতে সহায়ক হবে না। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই প্রবৃদ্ধিকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে এবং ১৫ শতাংশের কাছাকাছি আনার লক্ষ্যে কাজ করছে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেন যে, বর্তমান মূল্যস্ফীতি চাহিদা জনিত কারণে নয় বরং এটা সরবরাহের দিকের বিষয়। এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, অসামঞ্জস্যগুলোর বিপরীতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু চাহিদা ব্যবস্থাপনা যেমন অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত

তারল্য ইত্যাদির মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে, যা খুব সহজ নয়। এজন্য দরকার হবে বন্ড এবং বিলের সুদের হার বৃদ্ধি করার, যা পুনরায় বেসরকারি ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ গ্রহনের ব্যয় বৃদ্ধি করবে। তিনি এ বিষয়টিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উলেখ করেছেন যা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মোকাবেলা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গর্ভনর উলেখ করেন যে, সামষ্টিক অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচকই ভাল অবস্থায় রয়েছে। জাতীয় নিট রিজার্ভ ভাল অবস্থায় আছে। তিনি এই প্রশংসনীয় অর্জনের জন্য রপ্তানিকারক এবং অভিবাসী কর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বর্তমান আমদানিপত্র (এল সি) পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি মন্তব্য করেন, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এলসি খোলা এবং নিষ্পত্তি উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে মূল্য বিচারে যদিও এলসি পরিস্থিতির উন্নতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক উচ্চমূল্যের কারণে এর ভলিউম বা পরিমাণ নাও বাড়তে পারে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ স্বীকার করেন যে, বেসরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের ব্যয় অত্যন্ত বেশি। একই সময়ে তিনি উলেখ করেন, এই খাত উচ্চহারে মুনাফাও করছে। যেহেতু ঋণদানযোগ্য ফান্ড সীমিত, সে কারণে যদি গার্মেন্টস খাতের সুদের হার কমানো হয়, তাহলে অন্যরা বঞ্চিত হবে। তিনি রপ্তানিকারকদের অবদানের কথা স্বীকার করে উলেখ করেন যে, দেশের রপ্তানি খাত আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নতুন ও সৃজনশীল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

একটা শক্তিশালী সিঁড়ি ছাড়াই সরকার একটা ভঙ্গুর দালানের ছাদের ওপর আরও একটা তলা নির্মাণ করার উদ্যোগ নিচ্ছে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ উপসংহার টানেন এই বলে যে, দালানটি বাস্তবিকই ভঙ্গুর। যাই হোক, বেশ কিছু মেরামত কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যা দুর্বল দালানটির পিলারগুলোকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করবে এবং যা নিশ্চিতভাবেই প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে এক ধরনের ভালো ভিত্তি গড়ে তুলবে। ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবিক পক্ষেই অর্জন সম্ভব। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে একটা ঐকমত্য রয়েছে যে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট দক্ষ। সম্ভবত, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সেরা। ব্যাপকভাবে একটা বিশ্বাস রয়েছে যে, বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের পরবর্তী গন্তব্যস্থল।

অর্থ উপদেষ্টার প্রতিক্রিয়া

মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম সিপিডির মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত সমৃদ্ধ ও বহুমুখী মন্তব্যের প্রশংসা করেন। তিনি জানান যে, তিনি বাজেটের ওপর আরও মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য তিন দিন সময় বাড়িয়ে দিতে চান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যাই করা হোক না কেন, বাজেট কিছু লোক এবং কিছু গ্রুপকে আঘাত করবে এবং বাজেটপ্রস্তাব সমালোচনার বস্তু হবেই। এক্ষেত্রে ২০০৭২০০৮ অর্থবছরের বাজেটও ব্যতিক্রম নয়। বাজেটে বিভিন্ন দ্বন্দ্বমুখর স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের বিবেচনা ছিল দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি। এই বিবেচনায় সরকারকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে যেখানে জনগণের মতামতের প্রয়োজন। আর সেই কারণেই স্বার্থ সংশিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে সরকার।

বাজেটে দু'টি প্রধান সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা রয়েছে, তা হলো প্রবৃদ্ধি হার এবং মুদ্রাস্ফীতি। সরকার মনে করে, ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু এটা এমন কিছু নয়, যা অর্জন করা যাবে না। একই কথা খাটে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেও। তিনি বলেন, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় ভিত্তি বছরের উপাত্তের ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়। আগে থেকেই অর্থনীতি একটি উচ্চ ভিত্তির ওপর

দণ্ডায়মান আবার ভোগ্য পণ্যের ওপরও যথেষ্ট বাহ্যিক চাপ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তাই বছরের জন্য ৬.৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি অবাস্তব টার্গেট অথবা অবাস্তর ধারণা নয়।

ঘাটতি ইস্যুর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মোট ঘাটতি হবে জিডিপির প্রায় ৫.৬ শতাংশ। তার মধ্যে ১.৪ শতাংশ বিপিসির আনুমানিক দায়এর অবদান। বিপুল পাইপ লাই নের বিবেচনায় নিট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাস্তবসম্মত। এটা অবশ্যই প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করবে এবং এক্ষেত্রে কিছু কাঙ্ক্ষিত সংস্কার প্রয়োগ করারও প্রয়োজন হতে পারে। চলতি বছরের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, জানুয়ারি মাসে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জুনের মধ্যেই এটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সুতরাং, বাজেট সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়েছিল তা কোনক্রমেই অবাস্তব নয়।

অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করতে পারে কিনা তার উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন যে, বিপিসির অংশে দীর্ঘমেয়াদি বন্ড রয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতে মূল টাকা ও সুদ পরিশোধের ফলে এটা বাজেটের ওপর কিছু বোঝা চাপাবে। কিন্তু স্বচ্ছতা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা এবং বিপিসিকে ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহের স্বার্থে এটা একান্তই প্রয়োজনীয় একটা পদক্ষেপ ছিল। অর্থায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক কোন সমস্যা নেই।

রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থ উপদেষ্টা উলেখ করেন যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০.৪ থেকে ১০.৮ শতাংশে বৃদ্ধি একটা পরিমিত উদ্যোগ। এই পরিমিত লক্ষ্য যদি পূরণ করা না যায়, তাহলে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন অথবা বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে। কিন্তু এটা কোনক্রমেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যাপারে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, তিনি এডিপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার আরও পদ্ধতিগত পর্যালোচনা করতে চান এবং বাজেট বাস্তবায়নে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাজের বাধাসমূহ দূর করতে চান। তিনি বলেন, আনুষঙ্গিক সমস্যা পর্যালোচনার জন্য সংশোধিত এডিপি প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে চান না।

টার্গেট গ্রুপের মধ্যে ভর্তুকি বিতরণের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের জানান যে, সংলাপে বাজেট শেষ হওয়ার পরপরই তিনি ভর্তুকি পরিচালনা করার সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসবেন। তিনি নিশ্চয়তা দেন যে, এই ক্ষেত্রে তিনি যেকোন পদ্ধতিগত ত্রুটির মোকাবেলা করবেন, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, ভর্তুকি প্রকৃত পক্ষেই টার্গেট করা প্রাপকদের কাছে যাচ্ছে।

রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থ উপদেষ্টা স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ব্যয় পূর্বানুমোদিত। বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে একটা স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি রয়েছে। এক্ষেত্রে সুদ প্রদানেরও একটা ব্যাপার রয়েছে, যা চলতি বছরে পরিশোধযোগ্য হয়েছে। কারণ, আগের সরকারগুলো এইসব ঋণ গ্রহণ করেছে। তিনি উলেখ করেন, এসব কারণেই রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য পরিহারযোগ্য এবং অনুৎপাদনশীল রাজস্ব ব্যয়ের ব্যাপারে উপদেষ্টা নিশ্চয়তা দেন যে, সরকার অবশ্যই একে নিম্নমাত্রায় সীমিত রাখার চেষ্টা করবে।

অর্থ উপদেষ্টা দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সংশোধিত কর কাঠামোর বিষয়েও উত্তর দেন। তিনি বলেন, সত্যিকারের কার্যকর অর্থনৈতিক সুরক্ষা কেবল নামমাত্র শুল্কহার থেকে উপলব্ধি করা যাবে না। বিষয়টা হলো, অভ্যন্তরীণ মূল্যের ওপর মূল্য সংযোজনের তুলনায় বিশ্ববাজারের মূল্যের মূল্য সংযোজন প্রয়োগ হচ্ছে। এ কারণে যেখানে নামমাত্র সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ বা ৫৫ শতাংশ, সেক্ষেত্রে কার্যকর সংরক্ষণ বেড়ে দাঁড়াবে সম্ভবত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, এক্ষেত্রে একটা আপাত শুল্কহার থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসআরওএর মাধ্যমে একটি কম কর্মক্ষম শুল্কহার চালু রয়েছে। সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জও তুলে নিয়েছে। প্রচারিত আমাদনি রপ্তানি শুল্কের সাথে অতিরিক্ত সম্পূরক করও রয়েছে, যা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের আরও একটি উপাদান বলে উপদেষ্টা ব্যাখ্যা দেন।

কৃষিখাতে বরাদ্দের ব্যাপারে অর্থ উপদেষ্টা বলেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট একত্রে গত বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট শিল্প বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে অর্থ উপদেষ্টা উলেখ করেন যে, পাট শিল্প একটি রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে পরিগণিত। এটা ক্যাশ ইনসেনটিভসহ এক্সপোর্ট ইনসেনটিভও পেয়ে থাকে। যতদিন এটা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালিত হবে, ততোদিন এই খাত টেকসই হবে না। উলেখিত ইনসেনটিভ পাওয়া সত্ত্বেও পাবলিক বা সরকারি খাতের পাট শিল্প টিকে থাকার মত অবস্থানে নেই। তিনি বলেন, মাত্র কয়েকদিন হলো তিনি পাট মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর ৩০০ কোটি টাকা প্রদানের অনুরোধ পেয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, অর্থনীতিতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। এক সেক্টর যদি ভর্তুকি পায়, এক সেক্টর যদি কর সুবিধা পায়, কাউকে না কাউকে সেগুলো যোগান দিতে হবে। একইভাবে যারা পাট শিল্পকে সমর্থন করছেন তাদেরকে তিনি সাময়িক ধৈর্য্য ধরে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানান, এসব শিল্প সরকারি খাতে থাকলে সত্যিকার সুরক্ষা হবে কি না। তিনি মনে করেন, যদিও এটা সন্তুষ্ট হওয়ার মতো। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

অর্থ উপদেষ্টা বাজেটে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আলোকপাতের অভাব সম্পর্কে উত্তর দেন। তিনি বলেন, যদিও বাজেটে শ্রমশক্তিতে যুক্ত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে কিছু সরাসরি বলা হয়নি, বিনিয়োগ ব্যয় কাঠামো যা মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও তার বরাদ্দ, এগুলোর অধিকাংশই শ্রমঘন বা লেবার ইনটেনসিভ সেক্টর। যেমন– কৃষি, গ্রাম উন্নয়ন, পানি সম্পদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সর্বাধিক বরাদ্দ পেয়েছে। সরকার দুটো বিবেচনায় অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এগুলো বাছাই করেছে। প্রথমত, এগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং এগুলো অধিক শ্রমঘন প্রকৃতির হওয়ায় এসব সেক্টর অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, অধিক গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষত, জ্বালানি ও যোগাযোগ। এই বিনিয়োগ সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে বিশেষ করে বেসরকারি খাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বহুভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই বাজেটে কর্মসংস্থানের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি, এই সমালোচনা সম্ভবত সঠিক সমালোচনা নয়।

দেশে মূল্যস্ফীতির অবস্থা সম্পর্কে অর্থ উপদেষ্টা সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি উলেখ করেন যে, সরকার এই ইস্যুটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। বিশেষ করে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটি। সে কারণেই সরকার একটা নিরপেক্ষ সমীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা করেছে। আর সেই কাজটি করছে সিপিডি। সরকার সিপিডির গবেষকগণের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করছে যেখানে প্রধান উপদেষ্টাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এমন কি সিপিডিও স্বীকার করবে যে, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খুব অল্প কিছুই করার আছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে যা করা যায় সরকার ইতিমধ্যেই তা করেছে। তিনি বলেন যে, তিনি ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম, কেন ৫ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা সত্ত্বেও সয়াবিন তেলের দাম পরদিনই বৃদ্ধি পায়। তিনি মনে করেন, বাজার কাঠামোতে কিছু সমস্যা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সরকার আনুষঙ্গিক ইস্যুগুলোর মোকাবেলায় কিছু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রথমত, আমদানি শুল্ক ক্ষেত্রে সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকার বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)এর মাধ্যমে বিকল্প বাজার চ্যানেল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সরকার এই ক্ষেত্রে টিসিবিকে কতটা কাজে লাগানো যায় তা বিবেচনা করছে। বর্তমান বাজার কাঠামো ভাঙ্গার যে কোন তাৎক্ষণিক উদ্যোগ সফল নাও হতে পারে, যেহেতু ওই চ্যানেলগুলো দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে উঠেছে। বিপুল সংখ্যক মধ্যসত্ত্বভোগীর উপস্থিতির কারণে খামারের দাম এবং ভোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত দামের মধ্যে বহু ফারাক তৈরি হচ্ছে। এইসব মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের লোকদের দ্বারাও কিছু কর্মসংস্থান হচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেন, মূল্য পরিস্থিতিতে মধ্যমেয়াদি সমাধান উৎপাদন সামর্থ্য এবং সংগঠিত কৃষকদের সমবায়ের মধ্যে নিহিত।

উপদেষ্টা বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। খামারীদের সমবায়ের এমন একটা উদ্যোগ যা সরকার উৎসাহিত করতে চায়। কিন্তু টিসিবির কার্যক্রম প্রশংসনীয় নয়। পাবলিক সেক্টরে বাজারের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিকভাবেই অদক্ষ প্রমাণিত এবং এখন একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, ভবিষ্যতে তাকে যোগ্য করে গড়ে তোলা যাবে। সুতরাং সরকার মৌলিকভাবে বিকল্প বাজার চ্যানেল গড়ে তোলার জন্য এনজিও অথবা প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করতে পারে।

উদ্ধারকৃত অর্থ কীভাবে ব্যবহার হতে পারে এই ইস্যুতে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সাময়িকভাবে এগুলো সরকারের একটি ফান্ডে জমা হচ্ছে। এটা সরকারের একটা বিবিধ ধরনের রাজস্ব। তিনি নিশ্চয়তা দেন যে, সরকার খুবই সচেতন যে, এটা কোন নিয়মিত উৎস নয়। তিনি বলেন, এই খাত হতে সরকারের প্রাপ্ত অর্থ চলতি বছরের বাজেট ঘাটতিতে কাজে লাগবে। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা সংলাপ আয়োজন করার জন্য সিপিডিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি অন্যান্য আলোচকদেরও প্রশংসা করেন যারা তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি অংশগ্রহণকারী সবাইকে লিখিত আকারে তাদের স্ব স্ব মন্তব্য জানানোর জন্য অনুরোধ রাখেন যাতে সরকার সেগুলো গভীর ভাবে বিশেষণ করার সুযোগ পায় এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ

জনাব সাইদুজ্জামান তাঁর সযত্ন বিবেচনাপ্রসূত সমস্ত মন্তব্যের জন্য এবং সংলাপে উত্থাপিত সমস্ত বিষয়ের জবাব দেওয়ার জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাজেটের ওপর মতামত দেওয়ার জন্য বাড়তি আরও তিনদিন সময় পাওয়ায় অনেক গ্রুপ, সংস্থা ও ব্যক্তি তাতে স্বাগত জানাবেন।

জনাব সাইদুজ্জামান কিছু কিছু উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন, যা ডায়ালগে এবং সিপিডির বিশেষণে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি সর্বদাই এডিপির নিম্ন বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরেন, যা সিপিডি কর্তৃক ২০০৬২০০৭ অর্থ বছরে উলেখিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, দেখা যাবে কীভাবে ২০০৭২০০৮ অর্থ বছরে এই বাস্তবায়নের হারের উন্নতি হচ্ছে। এমন কি, তখন সরকারি বিনিয়োগ হবে জিডিপির মাত্র ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশ একটা বিনিয়োগহীন দেশই রয়ে গেছে। তিনি বিনিয়োগ এবং আইসিওআর সম্পর্কে আলোচনা করেন, যা ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন। বিদেশি সাহায্য এবং বিদেশি বিনিয়োগের অবদান লক্ষ্য অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে, তাঁর মতে, সরকারের প্রধান চিন্তা হলো, কীভাবে পাইপ লাইনে থাকা প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা যায়।

জনাব সাইদুজ্জামান মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশে বিরাজমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত ভালো ফল দিচ্ছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা শক্তিশালী বেসরকারি খাত পেতে হলে শক্তিশালী একটা সরকারি খাত থাকাও জরুরি, যাতে রেগুলেটরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অযাচিত ফলাফলসমূহ রোধ করা সম্ভব হয়। অর্থ উপদেষ্টা ও তাঁর সরকার সরকারি খাতকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জনাব সাইদুজ্জামান মন্তব্য করেন যে, একটা অর্থনীতির সরকারি খাত শক্তিশালী করার জন্য ১৮ মাস একেবারে কম সময় নয়।

জনাব সাইদুজ্জমান প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিগণকে সংলাপে উপস্থিত থেকে তাদের ভাবনাচি ন্তা বিনিময় করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতের বছরগুলোতেও সিপিডি তার বাজেট প্রতিক্রিয়া ও বিশেষণ অব্যাহত রাখবে।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ড. রীতা আফসার
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

আলি আহমদ
সাবেক সদস্য (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অধ্যাপক আবু আহমেদ
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. চৌধুরি সালেহ আহমেদ
মহাপরিচালক (মনিটরিং সেল) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, এনডিসি, পিএসসি
মহা পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস

জালালুদ্দিন আহমেদ
প্রোগ্রাম প্রধান, ব্র্যাক

মনজুর আহমেদ
উপদেষ্টা, এফবিসিসিআই; সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই

ড. নাজনীন আহমেদ
রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

ড. কাজি মেসবাহউদ্দিন
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

সৈয়দ এরশাদ আহমদ
প্রেসিডেন্ট, অ্যাম চ্যাম বাংলাদেশ

ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

অধ্যাপক সৈয়দ এম আহসান
রেসিডেন্ট ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, পলিসি অ্যানালাইসিস ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক

জাহাঙ্গীর বিন আলম
সাবেক সচিব, এফআইসিসিআই

মোহাম্মদ শাহ আলম
সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন

ড. শেখ মাকসুদ আলি
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

এম আমিনুজ্জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এবং সভাপতি, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

লে.ক. (অবঃ) এম আনিসুজ্জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গোব্রাল ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিঃ

আরিফা আকতার আনু
কোঅর্ডিনেটর, কর্মজীবী নারী

এম কে আনোয়ার, সাবেক কৃষি মন্ত্রী

এ এফ এম আসাদুজ্জামান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক

ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব

আবুল বাশার
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ

ড. আনোয়ারা বেগম
রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

মাহমুদা বেগম
পরিচালক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সালমা বেগম
সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ

ড. ইরিনা ভট্টাচার্য

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া
সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মাহমুদুল হক ভুঁইয়া
যুগ্ম সচিব (বাজেট২), অর্থ মন্ত্রণালয়

এম এ সাত্তার ভুঁইয়া
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ এবং পরিচালক,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরি
চেয়ারম্যান, অগ্রণী ব্যাংক এবং সাবেক সচিব,
অর্থ বিভাগ

সোহেল আহমদ চৌধুরি
সাবেক সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আব্দুল মুঈদ চৌধুরি
চেয়ারম্যান, ব্র্যাক বিডি মেইল নেটওয়ার্ক লিমিটেড
এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

আমিন চৌধুরী
অর্থ, পরিকল্পনা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়এর উপ দেষ্টা
মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব

আনোয়ারুউল্লআলম চৌধুরী (পারভেজ)
প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ

হেলাল আহমেদ চৌধুরি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পুবালী ব্যাংক

জাফর আহমেদ চৌধুরি
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মেজর জেনালে (অব) মইনুল হোসেন চৌধুরি, বিবি
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

এম এ রউফ চৌধুরি
পরিচালক, এফবিসিসিআই

ড. তৌফিক এলাহী চৌধুরি, বিবি
বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব

আশিস কুমার দাশ গুপ্ত
ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. মোঃ ইদ্রিস আলি দেওয়ান
বিভাগীয় প্রধান (প্রোগ্রামিং), পরিকল্পনা কমিশন

সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

জোনাথন ডান
আবাসিক প্রতিনিধি
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)

ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. এম ওসমান ফারুক
সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী

শাহ আব্দুল হান্নান
বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব

নুরুল হক
সদস্য, সিপিডি ট্রাস্টি বোর্ড এবং সাবেক সদস্য,
পরিকল্পনা কমিশন

আবদুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হক'স বে

মেসবাহুউল হক
চেয়ারম্যান, রেপটাইলস ফার্ম লিমিটেড

জবদুল হক
সাবেক উপমহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

আজমল হোসেন
নির্বাহী কমিটির সদস্য
বাংলাদেশ পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশন

মীর নাসির হোসের
প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই

মোশাররফ হোসেন
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, অ্যাকশন অন ডিসএবিলিটি
ইন ডেভেলপমেন্ট

শেখ এ কে মোতালেব হোসেন
সচিব
ইমপিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ডিভিশন

মিসেস তাসমিমা হোসেন
সম্পাদক, পাক্ষিক অনন্যা

ড. জাহিদ হোসেন
সিনিয়র ইকনমিস্ট, এডিবি

শাকিল হুদা
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

আনিসুল হক
সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ এবং চেয়ারম্যান, মোহাম্মদী গ্রুপ

মো: শাহেদুল হক
অতিরিক্ত সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এস মানজের হোসেন
আবাসিক পরিচালক
টাটা গ্রুপ, টাটা ইন্টারন্যাশনাল লি:

ড. জাহিদ হোসেন
সিনিয়র ইকনমিস্ট, দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

আসিফ ইব্রাহিম
পরিচালক, ডিসিসিআই এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউ এজ গার্মেন্টস

ড. মুহম্মদ ইব্রাহিম
চেয়ারম্যান, ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ

মাশাইউকি ইনাউই
রাষ্ট্রদূত, জাপান দূতাবাস

ড. মাহমুদা ইসলাম
অধ্যাপক, সমাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মইনুল ইসলাম
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এম তাজুল ইসলাম
পরিচালক, ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ

ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক সরাকারের মাননীয় উপদেষ্টা
অর্থ, পরিকল্পনা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

এম জামাল উদ্দিন
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ

মাহবুব জামিল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিঙ্গার বাংলাদেশ লি:

সাইফুজ্জামান চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

আইনার এইচ জেনসেন
রাষ্ট্রদূত, ডেনিশ দূতাবাস

ক্রিস্টিয়ান জারভেল
ফার্স্ট সেক্রেটারি, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল
অ্যাফেয়ার্স, নরওয়েজিয়ান দূতাবাস

কাজি জেসিন
সিইও, বায়োস্কোপ

ড. ফারা কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অ্যাকশন এইডবাংলা দেশ

হুমায়ুন কবির
সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি
অর্থ, পরিকল্পনা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

লায়লা রহমান কবির
সদস্য, সিপিডি ট্রাস্টি বোর্ড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেদারপুর টি কোম্পানি লি:

মাহফুজ কবির
রিসার্চ ফেলো, বিআইআইএসএস

মো: মোস্তফা কামাল
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা কলেজ

মশিহ উল করিম
প্রেসিডেন্ট, এফআইসিসিআই এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লি:

রঞ্জন কর্মকার
নির্বাহী পরিচালক
স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

মিতসুরু কায়ামা
গবেষক, জাপান দূতাবাস

আবুল কাইয়ুম
জয়েন্ট অ্যাডভাইজার
মনেটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

খবিরুদ্দিন
চিফ অ্যাডভাইজার
জাভা এডুকেশন ফাউন্ডেশন

ড. আকবর আলী খান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং
ভিজিটিং প্রফেসর, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

আনিস এ খান
চেয়ারম্যান, বিএলএফসিএ ও
সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইডিএলসি

এম হাফিজ উদ্দিন খান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং
বাংলাদেশের সাবেক
কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

মাহবুব হুসাইন খান
নির্বাহী সম্পাদক, দ্য নিউজ টুডে

মাশফিকুর রহমান খান
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোশারফ হোসেন খান
ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

অ্যাম্বাসাডর নজরুল ইসলাম খান
সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
লেবার স্টডিজ (বিআইএলএস) এবং সেক্রেটারি,
লেবার অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি

ড. ওমর ফারুক খান
সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার
কানাডীয় হাই কমিশন, সিডা

রাশেদ মওদুদ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস

রুনা খান
নির্বাহী পরিচালক, ফ্রেন্ডশিপ

শহিদুল্লাহ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিডিয়া নিউ এজ এবং
প্রকাশক, দি নিউ এজ

শায়লা খান
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (পলিসি সাপোর্ট অ্যান্ড
অ্যাডভোকেসি) এবং কোঅর্ডিনেটর, ইউএনডিপি

রাবেয়া খান
প্রভাষক
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশন

পারভিন মাহমুদ
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পিকেএসএফ

ক্রিপালি মানেক
ইকনমিস্ট, ডিএফআইডি

মো: লুৎফর রহমান মতিন
সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লুফা গার্মেন্টস লি:

মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ
সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, ওর্য়াকাস পার্টি

মুহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন
মহাপরিচালক, আইএসইডি, পাওয়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ইউনিট, পরিকল্পনা কমিশন

এইচ ই ফ্রাংক মিয়েকি
রাষ্ট্রদূত, জার্মান দূতাবাস, বাংলাদেশ

নাসরীন আউয়াল মিন্টু
প্রেসিডেন্ট, উইমেন ইন্টারপ্রেনিওর ইন বাংলাদেশ

সৈয়দ রানা মুস্তাফি
চেয়ারম্যান, মাদারল্যান্ড গ্রুপ এবং অর্থ কথা

জেসিকা মুবে
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কনসালটেন্ট, ইউএনডিপি

পরিমল মুৎসুদ্দি
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন

এ এম এম নাসির উদ্দিন
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ গবেষণা বিভাগ
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

এ এইচ এম নোমান
মহাসচিব, ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্য
রিয়েল পুওর (ডিওআরপি)

প্রফেসর ড. শাহেদা ওবায়েদ
নায়েমএর সা বেক ডিজি এবং শিক্ষাবিদ

ড. দুর্গা পি পোদিয়াল
ডিরেক্টর জেনারেল, সিরডাপ

তানভীরুল হক
মহাপরিচালক, রিহ্যাব

এ কে এম এ কাদের
প্রফেসর
ডিপার্টমেন্ট অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

জি এম কাদের
সাবেক সংসদ সদস্য

রোকেয়া কাদের
চেয়ারম্যান, দেশ গ্রুপ অব কোম্পানিজ

এ এস এম কাশেম
ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইসিসিবাংলা দেশ এবং
চেয়ারম্যান, দি নিউ এজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

ফেরদৌস কুদ্দুস
ইকনমিক এ্যান্ড কমার্শিয়াল স্পেশালিস্ট
ইউএস এম্বেসি

ড. কে সিদ্দিকুল্লইরব বানি
ভিজিটিং প্রফেসর অব ফিজিক্স
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি

ফজলে রাব্বি
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ড. মো: আব্দুল রহমান
সভাপতি, প্রবাসী কল্যাণ সমিতি

এ কে এম আতিকুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আতিউর রহমান
চেয়ারম্যান, উন্নয়ন সমন্বয়

বদিউর রহমান
সচিব, আইআরডি এবং চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

গোলাম রহমান
সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার

লতিফুর রহমান
সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রান্সকম গ্রুপ

এম এইচ রহমান
সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই

মাজেদুর রহমান
কান্ট্রি হেড, ব্যাংক আল ফালাহ লি:

ড. মাশিহুর রহমান
সাবেক সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মতিউর রহমান
সভাপতি
জাপানবাংলা দেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

ড. নাফিসুর রহমান
পরিচালক, ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দ্য ডিসঅ্যাবলড

সৈয়দ খালেদুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রহমান কেমিক্যালস লিমিটেড

জিল্লুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, সিসিএন এবং
হোস্ট, চ্যানেল আইত্ তীয় মাত্রা

ড. ডোরা র‍্যাপল্ড
রাষ্ট্রদূত, সুইজারল্যান্ড দূতাবাস

ড. মোহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক
সাবেক সংসদ সদস্য এবং কৃষি ও সমবায় সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ড. মাশরুর রিয়াজ
প্রাইভেট সেক্টর অ্যাডভাইজার, ডিএফআইডি

তালেয়া রাহমান
নির্বাহী পরিচালক, ডেমোক্রেসি ওয়াচ

মোনায়েম সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ফেডারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

ড. জায়েদি সাত্তার
সিনিয়র ইকনমিস্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ
পরিচালক, কর্মজীবি নারী

এ কে এম শামসুদ্দোহা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দোহাটেক নিউ মিডিয়া

ড. বাকের আহম্মেদ সিদ্দিকি
ভিজিটিং প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি

লুসিলি সরকার
রিসার্চ অফিসার, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এসইএইচডি)

অ্যাম্বাসাডর ফারুক সোবহান
সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং সভাপতি
বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)

ইনজেবজর্গ স্টোফ্রিং
রাষ্ট্রদূত, নরওয়েজিয়ান দূতাবাস

সাহিনা সুলতানা
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ইউএসএইড

এম সাইদুজ্জামান
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং
চেয়ারম্যান, ব্যাংক এশিয়া

ড. মোহাম্মদ তারেক
ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সাইদা তৌহিদ
ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, ডিএফআইডি

ড. আব্দুর নূর তুষার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গতি মিডিয়া লিঃ

নিয়েলস ভিনিস
ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন,
নরওয়েজিয়ান দূতাবাস

কার্টার উইলবার
ইকনমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল অফিসার
ইউএস দূতাবাস

ড. হাসান জামান
সিনিয়র ইকনমিস্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

ড. রিফাত জামান
অ্যাডভাইজার, ইকনমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল
অ্যাফেয়ার্স, নেদারল্যান্ড দূতাবাস

সাংবাদিকদের তালিকা

কামাল আহমেদ
করেসপন্ডেট, বাংলাদেশ বেতার

রাজু আহমেদ
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক আজকের কাগজ

মো: শাহানুর আলম
ক্যামেরাম্যান, বাংলাদেশ টেলিভিশন

রোকনুজ্জমান অঞ্জন
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ

সালাহউদ্দিন বাবুল
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব

মিস আফসানা বেগম
রিপোর্টার, দ্য এক্সিকিউটিভ টাইমস

মিরাজ আহম্মেদ চৌধুরী
স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, এন টিভি

ইকরান চৌধুরী
ফটোগ্রাফার, প্রেস ইনফমেশন ডিপার্টমেন্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়

রায়হান এম চৌধুরী
সিনিয়র রিপোর্টার, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস

অপূর্ব স্ট্যানলি ডোমার
স্টাফ রিপোর্টার, রেডিও টুডে

বিশ্বজিৎ দত্ত
চীফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়

মনোয়ার পারভেজ হালিম
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, উইকলি প্রোব

সানাউল হক
রিপোর্টার, সি এস বি নিউজ

রফিক হাসান
স্টাফ রিপোর্টার, ডেইলি স্টার

এম জামিল হোসেন
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের ডাক

জাকির হোসেন
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর

শেখ দিদারুল ইসলাম
সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ টুডে

রাশিদুল ইসলাম
স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

সাইদুল ইসলাম
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমার দেশ

আসিফ শওকত কল্লোল
সিনিয়র রিপোর্টার, যায় যায় দিন

কিশমত খন্দকার
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল

হানিফ মাহমুদ
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো

ফারুক মেহেদি
সিনিয়র রিপোর্টার, বৈশাখী টিভি

শ্যাম কান্তি নাগ
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ডেসটিনি

শামসুজ্জামান নিপু
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক নয়াদিগন্ত

সিরাজুল ইসলাম কাদির
করেসপন্ডেন্ট, রয়টার্স

কাওসার রহমান
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, দৈনিক জনকণ্ঠ

কাজি মাহফুজুর রহমান
রিপোর্টার, দৈনিক জনতা

টুটুল রহমান
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মানব জমিন

খাজা মইনুদ্দিন
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, দ্য নিউ এজ

রফিক উদ্দিন
রিপোর্টার, দৈনিক দেশ বাংলা

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের কাগজ।

গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জি

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৭

জানুয়ারি ০৩

- মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজার নীতির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নেট ওপেন পজিশন (এনওপি) নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

জানুয়ারি ০৪

- রেমিটেন্স প্রবাহ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩,৯৫৩ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় যা, এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জানুয়ারি ০৭

- ২০০৬ সালে রাজস্ব আদায়ে বিশেষ ভূমিকার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২২ কর কর্মকর্তাকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে নতুন তহবিল ছেড়ে সরকারকে ২,৪৫৫ কোটি টাকা ধার দেয়।

জানুয়ারি ১০

- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল করে।
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কুয়েত থেকে ২০০৭ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ২১ দশমিক ৫৬ লাখ টন জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়।

জানুয়ারি ১১

- রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।
- ভারত সরকার বর্তমান আখ কাটার মৌসুমে (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) রেকর্ড উৎপাদনের লক্ষ্যে চিনি রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

জানুয়ারি ১২

- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিশন লাইনসহ ১৪৫ কি:মি: দীর্ঘ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ফাইবার অপটিক সংযোগ বেসরকারি টেলি যোগাযোগ খাতে ব্যবহারের জন্য লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

জানুয়ারি ১৪

- বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার মাধ্যমে লাভজনক করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াতে তিনটি ঋণদাতা সংস্থা– এডিবি, বিশ্বব্যাংক এবং জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন সম্মিলিতভাবে ৮৮৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়। তবে ঋণদাতা সংস্থাগুলো ঋণ ছাড়ের আগে রেলওয়ের পুনর্গঠন, কোম্পানিতে রূপান্তরসহ কিছু শর্তারোপ করে।

জানুয়ারি ১৬
- নবনিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার জন্য চারটি বিধি প্রজ্ঞাপন আকারে জারির পদক্ষেপ নেয়।

জানুয়ারি ২০
- বাংলাদেশ আগামী ২০০৯ সালের মধ্যে ন্যাপথা থেকে অকটেন (আমদানিকৃত ক্রুড ওয়েলের বাই প্রোডাক্ট) তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। চট্টগ্রামে একটি ন্যাপথা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপনের জন্য সরকার মধ্য নভেম্বরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি মবিল যমুনা ফুয়েল কোম্পানির (এমজেএফসি) সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এমজেএফসি এ প্লান্ট স্থাপনে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জানুয়ারি ২১
- অন্তর্বর্তী সরকার ক্রয়, অর্থনৈতিক বিষয়, আইন শৃঙ্খলা, প্রশাসন এবং জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। একই সঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) পুনর্গঠন করা হয়।

জানুয়ারি ২৩
- বাংলাদেশের ৩৪ জেলার ৩০ মিলিয়ন লোককে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় সুবিধা দিতে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি) এবং ইউনিসেফ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে ডিএফআইডি ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড (৪৮৩ কোটি টাকা), ইউনিসেফ প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন পাউন্ড এবং বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৮.৯ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থায়ন করবে।

জানুয়ারি ২৪
- লালমনিরহাটে মঙ্গা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং কেয়ার বাংলাদেশ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

জানুয়ারি ২৫
- আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বেসরকারি খাতের ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের কার্যক্রমের ওপর ছয় মাসের স্থগিতাদেশ জারি করে সরকার।

জানুয়ারি ২৯
- বাংলাদেশ ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের প্রায় ৭০ শতাংশ বেনামী শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ জারি করে। বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের অভিহিত মূল্য ৩৬২.৬০ মিলিয়ন টাকা।

ফেব্রুয়ারি ৩
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সোনালী, অগ্রণী এবং জনতা ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় বিধির খসড়া অনুমোদন হয়। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে খসড়া স্মারক ও সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত বিধির অনুমোদন দেওয়া হয় যাতে এই তিনটি ব্যাংকের পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে স্বায়ত্ত্বশাসিত পরিচালনা পর্ষদের কথা বলা হয়।

ফেব্রুয়ারি ৫
- অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে শহর এলাকায় ১০০ ইউনিটের বেশি ব্যবহারকারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিটে ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- সরকার রূপালী ব্যাংকের অবশিষ্ট ২৬ শতাংশ শেয়ার ১২৮ মিলিয়ন ডলারে সৌদি প্রিন্স বন্দর বিন মোহাম্মদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এই ব্যাংকের ৯৩ শতাংশ মালিকানা সৌদি প্রিন্সের অধীন হবে।

ফেব্রুয়ারি ৭
- পুঁজি বাজার ও বীমা খাতে সুশাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং এডিবি'র পক্ষে এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ফেব্রুয়ারি ১২
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নগরীর পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পান্থপথ থেকে প্রগতি সরণী/গুলশান এভিনিউ পর্যন্ত ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেব্রুয়ারি ১৩
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সরকার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) লোকসান কাটিয়ে উঠতে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় এবং আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব বিবেচনা করে।

ফেব্রুয়ারি ১৫
- বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিকল্পনাকে সহায়তা করতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র সঙ্গে সরকার ১৭০ মিলিয়ন ডলারের তিনটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ফেব্রুয়ারি ১৭
- লোকসানের কারণে বাংলাদেশ বিমান ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ছাড়া বাকি সব অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়।

ফেব্রুয়ারি ১৮
- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ৩৬ জন সাবেক মন্ত্রী, এমপি এবং শীর্ষ স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীসহ মোট ৫০ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করে। নোটিশ প্রাপ্তির ৭২ ঘন্টার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনে হাজির হয়ে তাদেরকে সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দিতে বলা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২২
- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হাসান মসহুদ চৌধুরীকে সরকার দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়।

ফেব্রুয়ারি ২৬
- কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক বাণিজ্য মন্ত্রীদের দ্বিতীয় বৈঠকে অশুল্ক ও প্যারা-শুল্ক বাঁধা নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাফটা মন্ত্রীপরিষদ (এসএমসি) সাফটা বিশেষজ্ঞ কমিটির (সিওই) পরবর্তী বৈঠককে সামনে রেখে অশুল্ক বাঁধা সংক্রান্ত (এনটিএমএস) সাব-গ্রুপকে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের সুপারিশমালা পেশ করার নির্দেশ দেয়।
- দেশের ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ একীভূতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি খসড়া গাইড লাইন অনুমোদন করে। ব্যাংক একীভূতকরণে এ ধরণের গাইডলাইন এ উপমহাদেশে প্রথম। এ নীতিমালার ফলে ছোট ও দূর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠান একে অন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে তাদের ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারবে।

ফেব্রুয়ারি ২৭
- সরকার ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মেঘনা ঘাট তৃতীয় পর্যায় বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনিষ্পন্ন দরপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে।

ফেব্রুয়ারি ২৮
- প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে সরকার চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুড়িং কনটেইনার টার্মিনাল এসওটি (সার্ভিস, অপারেশন এন্ড ট্রান্সফার) ভিত্তিতে পরিচালনা করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে

এসওটি ভিত্তিতে টার্মিনালটি পরিচালনার বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ শেষ হবার পরই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

মার্চ ০১
- শহরের গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের দাম ৫ শতাংশ বৃদ্ধি কার্যকর করা হয়।
- এনবিআর দুর্নীতি দমন কমিশনের তালিকাভুক্ত ৫০ জন সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় লেনদেন স্থগিত করতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে অনুরোধ জানায় ।

মার্চ ০২
- এনবিআর ২০০৬-০৭ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি কমিয়ে আনতে অভিযান শুরুর উদ্যোগ নেয়। এই অভিযানের আওতায় নেওয়া পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে জরিমানা আদায়, নিরীক্ষিত ট্যাক্স ফাইলগুলো থেকে অতিরিক্ত আয়কর আদায় এবং কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর করের পুনঃসমন্বয়।

মার্চ ০৩
- প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ১৪৮৩ কোটি টাকার ৭টি প্রকল্প ফেরত পাঠায়। এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে নতুন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।

মার্চ ০৫
- উপদেষ্টা পরিষদ বিমানবন্দরের নতুন উন্মুক্ত আকাশ নীতি গ্রহণের আলোকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের পরিচালন ব্যবস্থাপনা থাই এয়ার ওয়েজের কাছে হস্তান্তরের ২০০৫ সালের চুক্তি পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উপদেষ্টা পরিষদেও সাপ্তাহিক এ বৈঠকে পরবর্তী সার্ক সম্মেলনে শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক প্রশাসনিক সহায়তার ওপর সার্ক চুক্তি অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মার্চ ০৬
- অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠানো হয়।
- ঢাকার রেল ভবনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিন দিনব্যাপী আন্তঃসরকার রেলওয়ে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ টি কে এম ইসমাইল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতীয় রেলওয়ের উপদেষ্টা (ট্রাফিক) অশোক গুপ্ত।

মার্চ ০৭
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভোগ্যপণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসাধু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে যৌথবাহিনীকে তাদের অভিযান পরিচালনা করার আহ্বান জানান।

মার্চ ১১
- প্রধান উপদেষ্টা মাঠ পর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের ভালো মানের খাদ্য সামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য বন্ধ করে দেওয়া গুদাম খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ধান, চাল, গম, ডাল, চিনি, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, গুঁড়ো দুধ ও শিশু খাদ্য–এই ৯টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদের জন্য পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করে একটি খসড়া প্রস্তাব দেয়।

মার্চ ১২
- বাংলাদেশ ব্যাংক সব বাণিজ্যিক ব্যাংককে মার্কিন ডলার কেনাবেচার পার্থক্য এক টাকার নিচে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশে এই ব্যবধান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

মার্চ ১৩
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের একটি ফলো-আপ বৈঠকে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেনার একটি নীতিমালা অনুমোদন দেয় হয়। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য একটি খসড়া নীতিমালা অনুমোদন দেয়, যেখানে ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জাতীয় নীতির আওতায় একটি নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

মার্চ ১৫
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদস্যরা ঢাকায় ১৭টি অস্থায়ী খোলাবাজার চালু করে।

মার্চ ১৭
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশ-ইইউ বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ৩১ মাস মেয়াদি একটি যৌথ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ স্থানান্তর, বাংলাদেশে স্বতন্ত্র কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট ইইউ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদানে সহায়তা এবং ইইউ সম্পর্কিত তথ্য বিতরণে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইইউ সদস্য দেশগুলোতে মানসম্মত পণ্য রপ্তানি উন্নয়নে খাত ভিত্তিক লবিং জোরদার করা।
- খাদ্য সংকট ও খাদ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থার সময় দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নেওয়া হয়।

মার্চ ২৫
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি চলতি বোরো মৌসুমে সারের চাহিদা মেটাতে সাড়ে ১২ হাজার টন সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।
- সরকারি খাতে সুশাসন জোরদার করতে ক্রয় সংস্কার আরও সুসংহত করতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকার পুনরায় উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের ফলে ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, মৌল খাত ভিত্তিক এজেন্সিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাইলট ভিত্তিতে ইলেক্ট্রনিক্স ক্রয় পদ্ধতির সূচনা এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক জবাবদিহিমূলক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মার্চ ২৮
- সরকার জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ-২০০৭ সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযান জোরদার করতে সরকারকে বিশেষ বিধান প্রণয়ণের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

মার্চ ২৯
- বিগত কয়েক বছর ধরে করদাতার সংখ্যা ১৫ লাখে স্থির থাকার কারণে এনবিআর নতুন করদাতা চিহ্নিত করতে একটি বিশেষ জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে। ১৫ মাস মেয়াদি এ জরিপ প্রাথমিকভাবে ঢাকায় শুরু হয় এবং পরবর্তীতে দেশব্যাপী চালু হবে। রাজধানীতে তিন সদস্য বিশিষ্ট ৮টি দল এ জরিপ চালাবে।

এপ্রিল ০২
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কুয়েত থেকে তেল আমদানির বিদ্যমান চুক্তি আরও এক বছর বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করে।
- জ্বালানি তেলের উচ্চ আমদানি মূল্যের কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত লোকসান কমাতে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ২১ শতাংশ এবং অকটেন ও পেট্রোলের দাম ১৬ শতাংশ বাড়ানো হয়।

এপ্রিল ০৩
- বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তিগুলোর ওপর বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ, সন্ত্রাস দমন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে নয়া দিলীতে ১৪তম সার্ক সম্মেলন শুরু হয়।

- সার্ককে কার্যকর করতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ পাঁচ দফা রোড ম্যাপ ঘোষণা করেন।
- আগামী বাজেটের আগে বিশ্বব্যাংক ২০০ মিলিয়ন ডলার ছাড় দিতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা জানা যায়। বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন সহায়তা ঋণের (ডিএসসি ৪) আওতায় শর্তগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকার সঠিক পথে থাকলে ওই ঋণ পাওয়া যাবে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিচালক সাদিক আহমেদ ঢাকায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ ধরনের ইঙ্গিত দেন।

এপ্রিল ০৫
- এখন থেকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) হিসেব শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক করবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে এফডিআই এর পরিসংখ্যান নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিনিয়োগ বোর্ডের মধ্যকার বিরোধের সমাপ্তি ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

এপ্রিল ০৬
- অর্থ মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংককে ৩১ মে ২০০৭ এর মধ্যে কোম্পানিতে রূপান্তরের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেয়।

এপ্রিল ০৭
- উপদেষ্টা পরিষদ সংশোধিত 'জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ ২০০৭' এবং 'আইন শৃংখলা বিনষ্টকারী অপরাধ বিষয়ক দ্রুত বিচার (সংশোধন) আইন ২০০২' এর অনুমোদন দেয়।

এপ্রিল ০৮
- পুঁজি বাজার উন্নয়নের অংশ হিসেবে আগেভাগেই প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

এপ্রিল ১০
- তিন বছরে ২০ মিলিয়ন গ্রাহকের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আরব আমিরাত ভিত্তিক ওয়ারিদ টেলিকম বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ মোবাইল ফোন অপারেটর হিসেবে তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।
- সরকার বাজেটে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে বরাদ্দ থেকে প্রায় ২০৯ কোটি টাকা মূল্যের ১.১৭ লাখ টন চাল খোলাবাজারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। যা আগে দরিদ্র লোকজনকে সহায়তা করতে কর্মসংস্থান কেন্দ্রীক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল।

এপ্রিল ১২
- বিদ্যুৎ এবং আর্থিক খাতে সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পুনর্গঠনের কারণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে বাজেট সহায়তা প্যাকেজের আওতায় জুনের আগেই ৩০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এপ্রিল ১৬
- সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা উপদেষ্টা পরিষদ বাতিল করে।

এপ্রিল ১৭
- বেশ কিছু নতুন হাইড্রো-জিওলজিক্যাল সমস্যার কারণে বড় পুকুরিয়া কয়লা উত্তোলন কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেয়। প্রতিদিন উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ৭০০ টন (মূল লক্ষ্যমাত্রা) থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ টনে নির্ধারিত করা হয়।
- চার মাসের মধ্যে ১২টি টেক্সটাইল ও পাট খাতের প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি-করণের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়।

- নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) পরিচালনা বেসরকারি খাতে সম্ভাব্য হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা চালাতে বিশ্বব্যাংকের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করে।
- চলতি বোরো মৌসুমে কৃষকদের চাল বিক্রিতে উৎসাহিত করতে সরকার প্রতি কেজি চালের দাম ২ টাকা বাড়িয়ে ১৮ টাকায় কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।

এপ্রিল ১৮

- বাংলাদেশ ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন বাড়িয়ে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এর উদ্যোক্তা শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেয়।
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) নির্বাচন কমিশনকে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এ কাজে প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা।
- রাজধানীর মানিকদি এলাকায় পাইলট প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় এডিবি ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ উন্নয়নে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'দ্বৈত কর পরিহার' এবং 'আর্থিক কৌশল প্রতিরোধ' (Prevention of Fiscal Evasion) সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করে।
- দু'দেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা জোরদার করার উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিবছর ভারত থেকে ১.২ লাখ টন হাই-স্পিড ডিজেল কিনতে রাজি হয়।

এপ্রিল ১৯

- বিজিএমইএ এবং বাংলাদেশ-ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্সের (বিবিসিসি) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুসারে বিবিসিসি এবং বিজিএমইএ যৌথভাবে যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কমিশনভুক্ত সদস্য দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণে কাজ করবে।

এপ্রিল ২০

- উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশ-মায়নমারের মধ্যকার বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে দু'দেশের সরাসরি সড়ক সংযোগ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

এপ্রিল ২২

- বিশ্বব্যাংক তার 'এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রকল্পের (ইজিবিএমপি)' আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কর্পোরেটাইজেশনে অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এপ্রিল ২৩

- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি পরবর্তী আমন মৌসুমের জন্য ৮০ হাজার মেট্রিক টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (এসএলআর) ও নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) না করায় সোনালী ব্যাংককে ৬৩ কোটি টাকা জরিমানা করে।
- ঢাকায় হোটেল শেরাটনে দু'দিনব্যাপী তুলা ও বস্ত্র সম্মেলন ২০০৬ শুরু হয়। আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের উন্নয়নের বিষয়টি সম্মেলনে গুরুত্ব পায়।

এপ্রিল ২৫

- সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) উটের জকি হিসেবে আহতরাসহ এ কাজে ব্যবহৃত সমস্ত শিশুকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ইউএই সরকারের সম্মতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ও ইউএই সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এপ্রিল ২৬

- দক্ষিণ এশিয়ার জন্য আইএফসি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান– দি সাউথ এশিয়া

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি (এসইডিএফ) এবং বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগ নেয়।

এপ্রিল ২৮ • বাংলাদেশ ও মায়ানমার তাদের সীমান্ত বাণিজ্যের বাইরে ব্যবসা ও পর্যটন উৎসাহিত করতে দু'দেশের মধ্যকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিষয়ক এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে।

মে ০১ • ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ পানি গমন পথ ও পরিবহণ চলাচল বিষয়ক প্রটোকল নবায়ন করে।

মে ০৬ • আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের চাপের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়।

মে ০৭ • চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এক বৈঠকে বন্দরে জাহাজে মালামাল উত্তোলন ও খালাস নেওয়ার পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে একমুখী পরিচালন (Single Point Operation) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

মে ০৯ • জাপানের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দেওয়া তাদের প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা প্রতিবেদনে সুপারিশ করে যে, কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপ গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

মে ১০ • প্রথমবারের মতো ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সম্মেলনে বক্তারা বাংলাদেশে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মে ১৫ • বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের পরিচালনা পর্ষদের ৩৬তম বৈঠকের আয়োজন করে। গত ৭ বছরের মধ্যে ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মে ১৬ • তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যকার 'দ্বৈত কর পরিহার' সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করে।

মে ১৭ • রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচালনার জন্য যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের রেজিস্টারের কাছ থেকে লাইসেন্স পায়।

মে ১৮ • প্রায় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাপেক্ষে দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ প্রকল্প ৭০ মেগাওয়াট তৃতীয় পর্যায়ের ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হয়।

মে ১৯ • উপদেষ্টা পরিষদ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে ২০০৭ সালের জুনের মধ্যে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের কিছু পদক্ষেপের অনুমোদন দেয়।

মে ২০ • অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলায় সেখানকার আমদানিকারকদের কাছ থেকে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকরা এক মিলিয়ন ডলারের বেশি স্পট অর্ডার পায় এবং পর্যায়ক্রমে আরও কয়েক মিলিয়ন ডলারের অর্ডার পাওয়ার ব্যাপারে আমদানিকারকদের আগ্রহের কথা জানতে পারে।

মে ২১
- সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকতর ভালো কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ ও ইউএই'র মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষর হয়।

মে ২৪
- অস্ট্রেলিয়া পরবর্তী বছর থেকে বাংলাদেশকে দ্বিপাক্ষিক সহায়তা ৩৩ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেয় যার ফলে তাদের সাহায্য দাঁড়াবে বছরে ৪৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
- বড় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এডিবি একটি নতুন ঋণ প্রস্তাব দেয় কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাবের ঝুঁকি পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই শ্রেয় মনে করে।

মে ২৮
- ব্রিটিশ কোম্পানি সিডিসি গোব্বলেক হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট, মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট এবং এনইপিসি ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ কোম্পানি তেনজং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়।

মে ২৯
- বিশ্বব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগের প্রশংসা করে এবং ২০০ মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন সহায়তা ঋণের (ডিএসসি) অনুমোদন দেয়।
- বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ ও বেলারুশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

মে ৩০
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স পায়।

মে ৩১
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে সরকার তিন বছর (২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর) মেয়াদি রপ্তানি নীতি ঘোষণা করে।
- নির্দিষ্ট কিছু রাস্তায় মোটরবিহীন যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রিকশাচালকদের জন্য বিশ্বব্যাংক ১১৫ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত অর্থায়ন অনুমোদন করে।

জুন ০২
- সরকার ২০০৭০৮ অর্থ বছরের জন্য ২৬,৫০০ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন করে।
- উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এবং ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্স (বিআইএস) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক প্রস্তাব অনুমোদন করে।

জুন ০৩
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সোনালী ব্যাংক যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের রেজিস্টারের কার্যালয়ে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ।

জুন ০৪
- কোরিয়াতে জনশক্তি রপ্তানি পুনরায় শুরু করতে এবং সেখানকার বস্ত্র খাতে ৫০ হাজার শ্রমিক চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

জুন ০৫
- সোনালী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স পায়।

জুন ০৭
- প্রথমবারের মতো একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুরো অর্থবছরের বাজেট

ঘোষণা করে। বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয় ৮৭ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা যা ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২০ হাজার ৩০১ কোটি টাকা বা ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা।

জুন ০৯

- দেশের রপ্তানি পণ্যগুলোর জন্য হুমকি হতে পারে এমন কিছু আমদানি পণ্যের ওপর 'সেফগার্ড কর' আরোপ দ্বারা স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা করতে এনবিআর একটি খসড়া বিধি সম্পন্ন করে।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে 'দ্বৈত কর পরিহার' সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করে। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জুন ১১

- এনবিআর চামড়া, বস্ত্র ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত কয়েক ধরনের মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ২০০৭ সালের নভেম্বরের মধ্যে ১৭টি ক্ষুদ্র পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে জার্মান সরকার বাংলাদেশের এনজিওগুলোকে ১ লাখ ১০ হাজার ইউরো অনুদান দেয়।

জুন ১২

- ২০০৭ সালের পঞ্জিকা বছরের প্রথম ৪ মাসে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ কমে যাবার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর আহ্বান জানায়।

জুন ১৪

- দুর্বল বাস্তবায়ন এবং 'প্রতিক্রিয়াশীল' প্রকল্প ব্যাবস্থাপনার কারণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ পানি সরবরাহ কার্যক্রম প্রকল্প থেকে ২৮০ কোটি টাকার অনুদান প্রত্যাহার করে।

জুন ১৭

- ঢাকা শহরের দরিদ্র লোকদের গ্রামভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য ইআরডি সচিব ও বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর ২৩ মিলিয়ন ডলারের দু'টি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জুন ২১

- শিক্ষা খাতে সরকারের নেওয়া প্রচেষ্টাকে আরও গভীর ও টেকসই করার জন্য সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) থেকে বিশ্বব্যাংক ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ অনুমোদন দেয়।

জুন ২৪

- অশুল্ক বাধা দূর করতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ঢাকা-দিল্লী পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনায় যোগ দিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব শিব শংকর মেনন ঢাকায় আগমন করেন।
- সরকারি সার কারখানাগুলোতে ক্ষতি সমন্বয় এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সার চোরাচালান ঠেকাতে সরকার প্রতি টন ইউরিয়া সারের দাম ৫১ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

জুন ২৬

- এডিবি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ৪৬৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ অনুমোদন দেয়।
- আন্তঃসীমান্ত অপরাধের বিষয়ে তথ্য বিনিময় এবং সীমান্ত ইস্যু ও পানি বণ্টন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী ভারত-বাংলাদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষ হয়।

জুন ২৭
- 'ভিশন পেপার–২০৩০' এর প্রস্তুতি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) অডিটোরিয়ামে ফরমুলেশন অফ আউটলাইন পারটিসিপেটরি পারসপেকটিভ প-ান (ওপিপিপি) নামে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করে। প্রকল্পটি দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে।

জুন ২৮
- রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করেন। কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোন সেট এবং রপ্তানিমুখী মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়।

জুন ২৯
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়াকে দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল হিসেবে মনোনীত করে এবং জেনেভাতে ২০০৭ সালের জুলাই ২-৫ সময়কালে অনুষ্ঠেয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এ দু'টি দেশকে তাদের সাফল্যগাঁথা উপস্থাপনের আহ্বান জানায়।

জুলাই ০১
- স্থানীয় শিল্প রক্ষায় সরকার আমদানির ওপর 'সেফগার্ড কর' আরোপের শর্ত প্রত্যাহার করে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে এটা প্রস্তাব করা হয়েছিল।

জুলাই ০২
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০টি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি অনুমোদন করে।

জুলাই ০৫
- শহর এলাকায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দিতে ৩০০ কোটি টাকার একটি স্কিম অনুমোদন করে।
- সরকার স্থানীয় বাজারে পণ্য সরবরাহ ঠিক রাখতে পরবর্তী ৬ মাসের জন্য ইলিশ মজুদ ও রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই ০৮
- ঢাকা-কোলকাতা যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের উদ্যোগের অংশ হিসাবে ৩০ সদস্যের ভারতীয় কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে একটি ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে সীমান্তের কাছে দর্শনা স্টেশনে পৌছায়।

জুলাই ১০
- ঢাকা এবং নয়া দিলী সম্ভাব্য ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা-কোলকাতা প্রতি সপ্তাহে দু'বার যাতায়াতসহ দু'টি ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দেশের ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার প্রস্তাবিত 'আমব্রেলা অ্যাক্ট ২০০৭' কে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর নতুন সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করে তা প্রত্যাহার করে।

জুলাই ১১
- কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধার মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য একটি এমওইউ স্বাক্ষর করে।

জুলাই ১৪
- সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের মধ্যকার চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের অন্যতম বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা গ্রুপ 'সিংহেলথ' এবং বাংলাদেশের গ্যালাক্সি হেলথকেয়ার সার্ভিসেস ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অফিস উদ্বোধন করে।

জুলাই ১৫
- আইএমএফ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিকে স্বাগত জানায়, যা বিভিন্ন পক্ষ থেকে সমালোচিত হয়।

- বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে মায়ানমারে একটি বড় পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যৌথ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা চালাতে একটি এমওইউ স্বাক্ষর করে।
- ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যানালাইটিস (আইআইবিএ)-এর বাংলাদেশ অধ্যায় গঠন করে।

জুলাই ১৭

- বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, সিমেন্ট, চামড়াজাত ও খাদ্য পণ্য আমদানিতে শ্রীলংকার আগ্রহ এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে দেশটির প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে সরাসরি আকাশ ও জলপথের যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য ২০০৭-এর আগস্টের মধ্যে ঢাকা ও কলম্বো বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জুলাই ১৮

- বাংলাদেশ ব্যাংক শহর এলাকার নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সর্বোচ্চ ১০ শতাংশে সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য গৃহায়ন স্কীম চালু করে।

জুলাই ২২

- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ঢাকাস্থ চীনা দুতাবাস একটি ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরকে সামনে রেখে একটি বাণিজ্য বৈঠকের আয়োজন করে। চীনের ৫০০ শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ১২ সদস্যের একটি দল ৫৩ মিলিয়ন ডলারের পণ্য কিনতে বাংলাদেশের ১২টি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার একটি যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি দু'দেশের মধ্যকার বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

জুলাই ২৩

- বাংলাদেশ বিমান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। সংস্থাটি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নামে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে।

জুলাই ২৫

- চীনের হাইনান প্রদেশের সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনুসকে সম্মান জানাতে চীনা দুতাবাসে গ্রামীণ ট্রাস্ট ও হাইনান প্রাদেশিক সরকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।
- বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া তাদের প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি) বৈঠক শেষ করে যেখানে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নে ঔষধ, তৈরি পোশাক ও অন্যান্য পণ্য আমদানিতে আগ্রহ দেখায়। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি বছর মাত্র ৫০৯ কোটি টাকা।

জুলাই ২৬

- দক্ষিণ কোরিয়া অনিয়মিত বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত পাঠাতে চায় যাতে তারা বিদেশি শ্রমিকদের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন নিয়োগ পরিকল্পনা 'এমপয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস)'-এর সুযোগ নিতে পারে।
- রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ৪ দিনব্যাপী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও কাপড়ের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু হয়।
- সরকারের এলজিএসপি'র জন্য এসডিসি ৫৩ মিলিয়ন ডলারের একটি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির উদ্বোধন করে।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার হুমকি ও ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য সরকার আইডিএ'র সঙ্গে ১৬ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জুলাই ২৭

- বাংলাদেশ ও মায়ানমার বাণিজ্য এবং জনগণের মধ্যে সংহতি বাড়াতে দু'দেশের সংযোগ হিসেবে ২৫ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করার চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জুলাই ২৯
- ঢাকা-কোলকাতা যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে ৩৫ সদস্যের বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিদল নিয়ে একটি ট্রেন ভারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

জুলাই ৩০
- আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের অংশগ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরী ম্যানিলার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

জুলাই ৩১
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করে।

আগস্ট ১
- ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরীর সঙ্গে এক বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইয়াং জীয়াচি বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং চীনের ত্রিদেশীয় সড়ক সংযোগ প্রকল্পের জন্য নির্মাণের ঢাকার প্রস্তাবকে বেইজিংয়ের সমর্থনের কথা পুনরায় উলেখ করেন।
- চর জীবিকায়ন প্রকল্পের (সিএলপি) মাধ্যমে ১০টি তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ৫০ হাজার বন্যাদুর্গত মানুষদের খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও ওষুধ এবং সহায়তা বাবদ যুক্তরাজ্য ২.৫ মিলিয়ন ডলার জরুরি সাহায্য দেয়।

আগস্ট ২
- আসিয়ান অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ম্যানিলায় আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশ 'আসিয়ান অঞ্চলের সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা (টিএসি)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- নয়া দিলীতে বার্ষিক স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশের মধ্যকার ভূমি এবং সীমান্ত নিয়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধান এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য স্থির করে।

আগস্ট ৫
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ভারত থেকে স্থানীয় বাজারের চেয়ে বেশি দামে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয় ।

আগস্ট ৬
- ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডবিউএফপি) বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত মানুষকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে দাতাগোষ্ঠি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানায় ।

আগস্ট ৭
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জাপান সরকারের সঙ্গে দু'টি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর আওতায় জাপান তার 'পিএইচআরডি' অনুদান কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ বায়ু, টেকসই জ্বালানি এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দু'টি প্রকল্প তৈরিতে বাংলাদেশকে ১.৬ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবে।
- বন্যাকবলিত কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য ঋণ খেলাপি কৃষকদের ঋণ পুনঃতফসিলের মাধ্যমে নতুন ঋণ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়। নির্দেশে ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের শর্ত শিথিল করার কথা বলা হয়।

আগস্ট ৮
- নয়া দিলীতে ভারত ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের দু'দিনব্যাপী বৈঠক শেষে তিস্তা এবং অন্য সাতটি অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনার নীতি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। এটি পরবর্তী যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠকে উপস্থাপিত হবে।

আগস্ট ১২
- বাংলাদেশের বন্যাকবলিত মানুষদের জরুরি ত্রাণের প্রয়োজনে ডবিউএফপি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ২০০০ টন চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ১৩
- রাজধানীতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জন্য ১ লাখ এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানির প্রস্তাব সরকার এই মতে নীতিগত অনুমোদন দেয় যে, স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে ওই প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- সৌদি বাদশা আবদুলাহর নির্দেশে বাংলাদেশের বন্যাক্রান্ত মানুষদের জন্য সৌদি আরব পাঁচটি কার্গো বিমান ভর্তি প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ সহায়তা পাঠায়।
- আশঙ্কাজনক হারে বিশেষায়িত ঋণ এবং প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় ৯টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

আগস্ট ১৪
- ডিএনডি বাধভূক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য উপদেষ্টা কাউন্সিল এক বৈঠকে এলজিইডি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডকে একটি সমন্বিত নীতিমালা তৈরির দায়িত্ব দেয়।

আগস্ট ১৫
- রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনশীল পর্যায়ে রাখতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসের জন্য সরকার 'খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি (ওএমএস)' চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- গ্রামীণ এলাকায় বহনযোগ্য ইস্পাত সেতু নির্মানের জন্য জাপানের ৬১১ মিলিয়ন ইয়েনের (প্রায় ৩৬ কোটি টাকা) অনুদান দিতে বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাইউকি ইনাউ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
- বন্যা আক্রান্ত মানুষদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে শ্রীলংকা ২৫ হাজার মার্কিন ডলার দান করে।

আগস্ট ১৮
- শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া এসোসিয়েশনের (সাফমা) ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সম্মেলনে সাফমা প্রেসিডেন্ট রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ১৬ সদস্যের একটি মিডিয়া দল যোগ দেয়।

আগস্ট ১৯
- লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপের (এলসিজি) সঙ্গে এক বৈঠকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা দাতাদের কাছে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত বাজেট সহায়তা এবং বন্যা পরবর্তী অবস্থা সামাল দিতে খাদ্য সাহায্যের আহ্বান জানায়।

আগস্ট ২০
- সরকার ঘোষণা দেয় যে, ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) ব্যবস্থা চালু রাখতে সরকার অক্টোবরে একটি নিলামের মাধ্যমে বেসরকারি অপারেটরদের কাছে লাইসেন্স বিক্রি করবে।
- কলম্বোতে এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের এইডস সংক্রান্ত ৮ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যাপকতার হার কম থাকা সত্ত্বেও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার বাড়ছে এমন পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকেও চিহ্নিত করা হয়।
- সরকার ২০০৩ থেকে ২০০৫ অর্থবছরে রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৮২টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি' প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ২১
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডবিউটিও) আসন্ন বৈঠকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা, রুলস অব অরিজিন এবং শুল্ক স্তর ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে তিনটি পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

আগস্ট ২২
- যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় আইসিডিডিআর'বি-কে প্রায় ৫ লাখ ডলার (৩.৪ কোটি টাকা) প্রদান করে।

আগস্ট ২৩
- প্রতিবছর ৮০ লাখ পিস তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি করতে ভারত সরকারের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির জন্য পদ্ধতি চূড়ান্ত করে সরকার।

আগস্ট ২৪
- বিগত মাসগুলোতে খুনসহ বাংলাদেশী শ্রমিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলার প্রেক্ষিতে মালদ্বীপের রাজধানীতে কর্মরত ২৫ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা মালে'র সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আগস্ট ২৭
- ঢাকায় আয়োজিত এক কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের হারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

আগস্ট ২৮
- ভারতে প্রতি বছর ৮০ লাখ পিস তৈরি পোশাক শুল্কমুক্ত রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা কাউন্সিলের বৈঠকে ব্যাংকিং খাতকে আরও দক্ষ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর সংশোধন করতে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৭-এর খসড়া অনুমোদন করা হয় ।

আগস্ট ২৯
- ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক সার্বিক বিষয়ে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে নতুন করে পর্যালোচনা করতে ঢাকায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্ট ৩০
- ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা (পিইআরপি) প্রকল্পে যুক্তরাজ্য ২০ মিলিয়ন ডলারের (১৪০ কোটি টাকার সমান) সাহায্য দেয়।
- বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে একে অপরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রপ্তানি বাড়াতে সুবিধা প্রদান করতে দু'টি দেশ সম্মত হয়।

আগস্ট ৩১
- দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে একটি বহুমুখী যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উপায় উপকরণ নিয়ে আলোচনা করতে নয়া দিলীতে সার্কভুক্ত ৮ দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ মন্ত্রীরা মিলিত হন।
- অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম এবং সফররত ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) প্রেসিডেন্ট আহমেদ মোহামাদ আলীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সরকার ও আইডিবির মধ্যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিগুলোর আওতায় বাংলাদেশের কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন খাতে আইডিবি ৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করবে।

সেপ্টেম্বর ৩
- রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি রোধে বিডিআরের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ঢাকায় ১০০টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের কার্যক্রম শুরু হয়।
- ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার প্রস্তুতি (পিইআরপি) প্রকল্পে কোরিয়ার সরকার ৫ লাখ মার্কিন ডলার প্রদান করে।

সেপ্টেম্বর ৪
- বাংলাদেশ পরিদর্শনে এসে ইন্টেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ ব্যারেট 'ইন্টেল ওয়ার্ল্ড এহেড প্রোগাম' চালুর ঘোষণা দেন। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী সাধারণ লোকজনের মাঝে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

সেপ্টেম্বর ৫
- আয়কর এবং ভ্যাট-এ যৌথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে আইএমএফ-এর প্রস্তাব এনবিআর প্রত্যাখান করে।

- ইউএনডিপি'র ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ল্যারি মারামিস এবং সুইডিশ কাউন্সিলর ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ওলা হ্যাল্‌গ্রিন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যার আওতায় সুইডেন নির্বাচন কমিশনের ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রকল্পে (পিইআরপি) ১ মিলিয়ন ডলার দেবে।

সেপ্টেম্বর ৬

- কৃষিখাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার দু'টি নতুন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে একটি সিরাজগঞ্জে নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড নামে এবং অপরটি ফেঞ্চুগঞ্জে ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির (এনজিএফএফ) পরিবর্তে শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড নামে স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।
- সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসাবে পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করতে ঢাকায় তিন দিনব্যাপী পর্যটন মেলা শুরু।

সেপ্টেম্বর ৯

- ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের প্রভাবের বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানোর পদক্ষেপ নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।
- প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে দেশের বন্যাকবলিতদের জন্য ইন্দোনেশিয়া ১ লাখ মার্কিন ডলার দান করে।
- বাংলাদেশের বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য জাতিসংঘ কেন্দ্রীয় জরুরি তহবিল ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে।

সেপ্টেম্বর ১০

- ঢাকায় বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা এবং দূর অনুধাবন (স্পারসো) প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তনে প্রতিরক্ষা সচিব কামরুল হাসান নতুন স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনের উদ্বোধন করেন।
- জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসাবে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।
- বাংলাদেশের হতদরিদ্রদের জন্য খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য অস্ট্রেলিয়া প্রায় ৭৮.২ কোটি টাকা মূল্যের ৩৮,৫৫০ টন গম এবং দান করে।
- সারাদেশে ১৫ হাজার ৪৪০ ডিলারের মাধ্যমে সরকার খোলাবাজারে বিক্রি (ওএমএস) কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রি শুরু করে।

সেপ্টেম্বর ১৪

- নয়া দিল্লীতে সেপ্টেম্বরের শেষে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন বন্ধ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে সার্কভুক্ত দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সম্মত হয়। এছাড়াও তারা যতো দ্রুত সম্ভব প্রস্তাবিত আঞ্চলিক সহায়তা তহবিলের কার্যক্রম শুরু এবং দক্ষিণ এশিয়ার পুঁজি বাজার উন্নয়নে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠনের ব্যাপারে সম্মত হন।

সেপ্টেম্বর ১৬

- ভারতে প্রতি বছর ৮০ লাখ পিস বাংলাদেশী পোশাক শুল্কমুক্ত প্রবেশের ব্যাপারে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- চলমান ত্রাণ ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য ভারত বাংলাদেশকে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান দেয়।

সেপ্টেম্বর ১৭

- রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে শ্রম অধিকার না রাখার অভিযোগে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি অধিকার গ্রুপ প্রচারণা শুরু করে।
- ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ (পিইআরপি) প্রকল্পের জন্য নরওয়ে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশস্থ নরওয়ের রাষ্ট্রদূত ইনজেবজর্গ স্টফরিং এবং ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি রেনেটা ডিস্যালীন।

- চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংককে আইএমএফ পরামর্শ দেয়।

সেপ্টেম্বর ১৮
- সফররত আইএমএফ মিশন নীতি সহায়ক কৌশল (পিএসআই) স্বাক্ষর না করতে সরকারের অবস্থানের কথা স্বীকার করে।
- ভাড়া করা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানির ওপর এনবিআর ১০ শতাংশ কর বেঁধে দেয়।
- ঢাকায় ৩২টি বিদেশি মিশনের কুটনৈতিক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা সংগ্রহ করে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফেরিত এরগিন এবং ভারতের হাই কমিশনার পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী বন্যাদুর্গতদের জন্য হস্তান্তর করেন।

সেপ্টেম্বর ২০
- সরকার জেনেভাস্থ জাতিসংঘের দপ্তরগুলোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেপ্টেম্বর ২২
- জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের (ইউএনজিএ) ৬২তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

সেপ্টেম্বর ২৪
- হোটেল সোনারগাঁওয়ে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) এর ১৫তম কারিগরি কমিটি (টিএনটি) বৈঠকের আয়োজন করে। শ্রীলংকার বাণিজ্য মন্ত্রী ডি জি ম্যানেল ডি সিলভা এতে সভাপতিত্ব করেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ লেনদেন প্রতিবেদনে (সিটিআর) ৫ লাখ টাকার পরিবর্তে ৭ লাখ ও তার বেশি লেনদেনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশ দেয়।

সেপ্টেম্বর ২৫
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং গ্যারিসন ইটিকা বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে গ্যারিসন ইটিকা বাংলাদেশ লিমিটেড আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে ইপিজেড এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করবে।

সেপ্টেম্বর ২৬
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রণীত ২০০৭-এর বিশ্বের দুর্নীতি ধারণা সূচকে (সিপিআই) দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের ৩য় থেকে উন্নীত হয়ে ৭ম অবস্থানে পৌঁছে।
- ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এবং বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় বলা হয়, ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে ১৭৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আগের অবস্থান থেকে ১৮ ধাপ নিচে নেমে ১০৭তম স্থানে পৌঁছায়।

সেপ্টেম্বর ২৮
- বাংলাদেশের বন্যায় সহযোগিতা হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনকে (আইডিএ) ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ অনুমোদন দেয় বিশ্বব্যাংক।

সেপ্টেম্বর ৩০
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে তাদের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগের পরামর্শ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

অক্টোবর ০২
- শান্তি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদানের জন্য শ্রীলংকা, কেনিয়া, কানাডা এবং

বাংলাদেশকে যৌথভাবে 'দ্য রাইট লাইভলিহুড' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় কম খরচে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ সুবিধা সম্বলিত সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম চালু করায় বাংলাদেশের গ্রামীণ শক্তিকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অক্টোবর ০৩
- মালয়েশিয়ার মন্ত্রী পরিষদ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ০৪
- ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশ কর্মসূচিতে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র ১৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ০৫
- বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) সমন্বয় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়।

অক্টোবর ০৬
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সংশোধন করার প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করে। এর ফলে ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফার ওপরে ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করার বিধান করা হয়।
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার বাণিজ্য বাড়াতে কাঠমান্ডুতে দু'দেশের সচিব পর্যায়ের দু'দিনব্যাপী একটি বাণিজ্য আলোচনা শুরু হয়।

অক্টোবর ০৭
- সিটিব্যাংক এনএ এবং ডিআইজিআই টেলিকম্যুনিকেশন এসডিএস বিএইচডি যৌথভাবে মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা পাঠানো সংক্রান্ত একটি সেবার উদ্বোধন করে।

অক্টোবর ০৮
- নেপাল থেকে পণ্য আনা নেওয়ার ট্রানজিট হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রোহানপুরকে রেলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।

অক্টোবর ০৯
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপদ রেমিটেন্স প্রেরণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর জন্য নীতিমালা কঠোর করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

অক্টোবর ১০
- উন্নয়নশীল দেশ বিশেষত এলডিসিগুলোর নাগরিকদের দেশের বাইরে বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শ্রম সেবার উন্মুক্ত চলাচল উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগ নবায়নে জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানায় বাংলাদেশ।
- দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকার একটি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট গঠন করে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট লিকুন জি তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

অক্টোবর ১১
- অর্থনৈতিক সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি লোকসান কমাতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ৮টি পাটকল (বন্ধ হওয়া ৪টি সহ) বেসরকারি খাতে লিজ দেওয়ার অনুমোদন দেয়।
- সফররত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিকুন জি বাংলাদেশের বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
- সারা দেশে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০টি ছোট বিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

অক্টোবর ১২
- বাংলাদেশের দরিদ্র শিশুদের জন্য নিউইয়র্ক থেকে ২ লাখ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেন নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস।

অক্টোবর ১৬
- তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানির নিম্নগতির পরও সরকার ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জন্য ১৪.৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

অক্টোবর ১৭
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশের অনুমতি পেতে ইউএস কংগ্রেসে উত্থাপিত একটি সাম্প্রতিক বিলের ব্যাপারে দরিদ্র্য দেশগুলোর পক্ষে লবিং করার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ।

অক্টোবর ১৯
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার পদক্ষেপের প্রশংসা করে বিশ্বব্যাংক সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতি দেয়।
- দালালদের প্রতারণা রোধে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ডাটা ব্যাংক থেকে বিদেশে চাকুরি প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
- ডবিউটিও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত সমন্বয় কাঠামোর (ইআইএফ) আওতায় তহবিল সংগ্রহ করতে সরকার ৩৩টি বাণিজ্য সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ২০
- স্থানীয় জনগণের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান স্থানান্তরের অভিপ্রায়ে বিওআই যেকোন বিদেশিকে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের বেশি কাজ করার অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ২১
- বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ খেলাপিদের ওপর কঠোর হতে এবং ব্যাংকের মূলধন বাড়ানো সংক্রান্ত আইএমএফ'র পরামর্শ আপাতত বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ২২
- ঈশ্বরদী ইপিজেড এবং এর আশেপাশের এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে মেসার্স মনটিকোর টেকনোলজি লিমিটেডের সঙ্গে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা) কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেপজা কার্যালয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

অক্টোবর ২৩
- বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাবার প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ লোকসান হবে বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ধারণা করে।
- সফররত কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে যৌথ কর্মসূচির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অক্টোবর ২৪
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ইরি-বোরো মৌসুমে সারের যেকোন সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টন ইউরিয়া সার আমদানি করার অনুমোদন দেয় ।
- পুনঃউৎপাদনক্ষম জ্বালানি প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে

সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য 'গ্রামীণ শক্তি' ২০০৭ সালের ক্যাথেরিন এম স্যাওনসন ইক্যুয়ালিটি টেক মিউজিয়াম পুরস্কার লাভ করে।

অক্টোবর ২৫

- নয়া দিলীতে মন্ত্রী পর্যায়ের তিন দিনব্যাপী বৈঠক শেষে সার্কের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরা সন্ত্রাস দমনে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ব্যাপারে পারস্পরিক আইনী সহায়তার জন্য একটি কনভেনশন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
- নতুন দারিদ্র্য বিমোচন প্রবৃদ্ধি সহায়তার (পিআরজিএফ) শর্ত হিসেবে আইএমএফ একটি সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সরকারের জন্য ২০টি শর্ত আরোপ করে।
- কুয়েত সরকার সেদেশের শ্রমিকদের আবাসস্থল স্থানান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে কুয়েতে নির্দিষ্ট শ্রেণীর বাংলাদেশী শ্রমিকরা খুব তাড়াতাড়ি একই উদ্যোক্তার আওতায় চাকুরি পরিবর্তন করতে পারবে।

অক্টোবর ২৮

- সার্ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে ভারতের তৈরি পূর্ববর্তী খসড়ার ওপর সদস্য দেশগুলো চুক্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় সার্ক দেশগুলোর আইন বিশেষজ্ঞরা অপরাধ বিষয়ে পারস্পরিক আইনী সহায়তার (এমএলএ) খসড়া চূড়ান্ত করার আহ্বান জানায়।

অক্টোবর ৩০

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলী খানকে প্রধান করে সরকার ১৭ সদস্য বিশিষ্ট রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) গঠন করে।
- নির্বাচিত রপ্তানিমুখী শিল্পকে সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) পরিমাণ ১০০ মার্কিন ডলার থেকে ১৫০ ডলারে উন্নীত করে।

নভেম্বর ০১

- রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বিচার বিভাগ অবশেষে একটি ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে।
- সুশাসন জোরদারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন অভিযানকে অধিকতর সুদৃঢ় পর্যায়ে নিয়ে যেতে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এডিবি বাংলাদেশকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়।

নভেম্বর ০৩

- সাম্প্রতিক দেশব্যাপী বন্যার কারণসহ বিশ্বব্যাপী তেল ও খাদ্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যাবার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা কামনা করে বাংলাদেশ।

নভেম্বর ০৪

- সফররত বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি জোয়েলিক অধিকতর ভালো বাণিজ্য পরিবেশ তৈরিতে ব্যাংকের কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তার প্রস্তাব দেন।
- বন্যা পরবর্তী খাদ্য এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহায়তা দিতে দেশের তিনটি এনজিওকে ফ্রান্স সরকার ৯ লাখ ৪৮ হাজার ইউরো (৯ কোটি টাকার বেশি) অনুদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

নভেম্বর ০৫

- কুয়েতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাঠাতে মাসিক নূন্যতম বেতন ৫০ কুয়েতি দিনার বা ১২ হাজার টাকার সমপরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
- বাংলাদেশের সকল ব্যাংক কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭-এ ব্যাংকের নূন্যতম মূলধন বাড়ানো হয়।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের

(জেডবিউজি) দু'দিনব্যাপী বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে ভারত থেকে বাংলাদেশে চাল, গম এবং ডাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে ভারতকে অনুরোধ জানায়। অপরদিকে ইলিশ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে অশুল্ক এবং প্যারা শুল্ক বাধা দূর করতে ভারতকে অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ।

- বন্যা দুর্গতদের জন্য সৌদি বাদশা আবদুলাহর পাঠানো প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণের ১ দশমিক ২ লাখ মেট্রিক টন চাল বাংলাদেশ গ্রহণ করে।

নভেম্বর ০৬

- চাল, গম এবং ডাল রপ্তানির ওপর ভারতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতির মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী বাণিজ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের (জেডবিউজি) বৈঠক শেষ হয়।
- সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে যেতে এডিবি বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তা বাড়ায়। বাংলাদেশের সুশাসন প্রকল্পে এডিবি চার বছর মেয়াদে তিন ভাগে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ ছাড় করবে।

নভেম্বর ০৭

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চমৎকার উলেখ করে ভারতীয় হাই কমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী অর্থনীতি ও বাণিজ্যসহ দু'দেশের সবগুলো খাতেই সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নভেম্বর ০৮

- বর্ধিত চাহিদা পূরণে ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ১৪০০ কোটি টাকার উলেখযোগ্য পরিমাণে চাল এবং সার আমদানির অনুমোদন দেয়।
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব রূপালী ব্যাংকের বিক্রি প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম শেয়ার বাজার এবং সরকারিভাবে ব্যাংকটির শেয়ারের লেনদেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

নভেম্বর ০৯

- ২০তম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টারে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক চুক্তিতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমত জাহান স্বাক্ষর করেন। এর ফলে ইউরোপ থেকে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৮১ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশও সংযুক্ত হবে।

নভেম্বর ১০

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সেবার উন্নতি করতে একটি প্রকল্পে পাঁচ উন্নয়ন সহযোগী (বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান সরকার, ড্যানিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা (ড্যানিডা) এবং কোরীয় সরকার) বাংলাদেশকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়।

নভেম্বর ১১

- উপদেষ্টা পরিষদ 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৭'-এর অনুমোদন করে।

নভেম্বর ১২

- ঢাকার স্থানীয় এক হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-মায়ানমার যৌথ বাণিজ্য কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠকে বাংলাদেশের একটি সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করতে ইয়াংগুনকে প্রস্তাব দেয় ঢাকা। উৎপাদিত সার পরবর্তীতে সীমান্তের মাধ্যমে স্থানান্তর হবে।
- করের আওতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান আয়কর রিটার্ন ফরমকে সহজ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে।
- বিশেষ কর্মসূচির আওতায় অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম কমাতে দেড় বছর বিরতির পর মায়ানমার থেকে পুনরায় চাল আমদানি শুরু হয়।

নভেম্বর ১৩
- অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর থেকে নির্ভরতা কমাতে এবং শ্রমিক অসন্তোষ নেভাতে মালয়েশিয়া বিদেশি শ্রমিকদের নিয়োগ ও বেতনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে একটি কঠোর আইনের খসড়া তৈরি করে।

নভেম্বর ১৫
- পৃথক 'ভেন্ডর' চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সোনালী, জনতা এবং অগ্রণী ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- উত্তর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটারের ওপরে শক্তিশালী বায়ু ও প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস সম্বলিত ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে বিশেষ করে খুলনা এবং বরিশালের ওপর আঘাত হানে।

নভেম্বর ১৬
- ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত মানুষদের সহায়তার জন্য প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে ৯.৫ কোটি টাকা এবং খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে ১১ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ করে সরকার।

নভেম্বর ১৭
- ঘূর্ণিঝড় সিডরে কমপক্ষে ৬ লাখ মেট্রিক টন আমন শস্যের ক্ষতি হয়েছে বলে সরকারি হিসেবে উলেখ করা হয়।
- ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষদের জন্য ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে জাতিসংঘ, জার্মান এবং বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তহবিল বরাদ্দ করে।
- উপদেষ্টা কাউন্সিলের একটি বিশেষ বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় কবলিত জেলাগুলোতে গৃহ নির্মাণে জরুরি সহায়তা হিসাবে ৩৫ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে দ্রুত গতিতে জরুরি ভিত্তিতে ভেঙ্গে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে বলা হয়।
- ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর খুচরা ও পাইকারি কাঁচাবাজারে অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যায়।

নভেম্বর ১৮
- ঘূর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহায়তা কামনা করে সরকারের আনুষ্ঠানিক আবেদনে সাড়া দিয়ে দাতাদেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার আশ্বাস দেয়।

নভেম্বর ১৯
- ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষদের জন্য ১৪২ মিলিয়ন ডলারের অধীক বৈদেশিক সহায়তার আশ্বাস পায় সরকার।
- ঘূর্ণিঝড় আক্রান্তদের জন্য এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশ সাহায্যের আবেদন জানায়।

নভেম্বর ২০
- সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত মানুষদের জরুরি সহায়তার জন্য বিভিন্ন দেশ এবং দাতা সংস্থা মানবিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেয়।
- চট্টগ্রামে দেশের প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রদর্শনী শুরু হয়।
- প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার গৃহহীন মানুষকে সহায়তা করতে বিভিন্ন দেশের অনাবাসী বাংলাদেশীরা তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়।

নভেম্বর ২১
- ঘূর্ণিঝড় আক্রান্তদের ত্রাণ সহায়তা এবং তাদের পুনর্বাসনে অনেক দেশ,

দাতাগোষ্ঠী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক সর্বোচ্চ ২৫০ মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয়।

- ডিসেম্বরের প্রথম থেকে ২৫ লাখ পরিবারকে ভিজিএফ কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি বিভিন্ন ধরনের ৯০ হাজার টন সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।

নভেম্বর ২২

- সরকারের ৩টি পর্যায়ে পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ ঘূর্ণিঝড় সিডরে আঘাতপ্রাপ্ত দক্ষিণ এবং দক্ষিণপশ্চিম জেলার মানুষদের জন্য ৫৫০ মিলিয়ন ডলারের সহায়তার আশ্বাস দেয়।

নভেম্বর ২৩

- প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে বেঁচে যাওয়া মানুষদের সহায়তার জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য বাসমতি ছাড়া অন্য চাল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ভারত।
- বরগুনা এবং বাগেরহাট জেলার সিডর আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি চিকিৎসক দল বরিশালে পৌঁছে।

নভেম্বর ২৪

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার হিসেব পদ্ধতি যাচাই করতে এডহক ভিত্তিতে একটি পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। সংসদ না থাকায় মহাহিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) কার্যালয় থেকে পাঠানো বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত উলেখযোগ্য সংখ্যক অডিট রিপোর্টও তারা নিরীক্ষা করবে।
- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য মার্কিন নৌবাহিনীর প্রায় ২,৩০০ সদস্য এক থেকে দুই দিনের মধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি নেয়।
- ঢাকায় সার্কের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বৈঠকে সদস্য দেশগুলো আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে অশুল্ক ও প্যারা শুল্ক বাধা দূরীকরণের আহ্বান জানায়।

নভেম্বর ২৫

- ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় শস্যের ব্যাপক ক্ষতির কারণে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন ঘাটতির আশংকার প্রেক্ষিতে নূন্যতম ২ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার দাতাদের অভিহিত করে।
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও জেলেসহ ধ্বংস হয়ে যাওয়া গৃহপালিত পশু ও পোল্ট্রি খাতের পুনরুদ্ধারে স্বল্প সুদে ঋণ (সফট লোন) প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে ১৩০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
- ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সরকারকে দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি জেলার সিডর আক্রান্ত মানুষদের মাঝে বিতরণের জন্য নগদ টাকা, খাদ্য ও পোশাকসহ প্রায় ২০২৫ কোটি টাকার সমমূল্যের ত্রাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
- সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত শিশুদের সহায়তার জন্য পিরোজপুর, বরগুনা, পাথরঘাটা, দুবলার চর এবং অন্যান্য অঞ্চলে ২০০টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পরিচালিত প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে কোরিয়ার ইয়াংওন কর্পোরেশন ১ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তা দেয়।

নভেম্বর ২৬

- প্রথমবারের মতো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর হিলির স্থল বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়।
- নতুন ইউএস ট্রেড বিল পাস করাতে দেশকে দিকনির্দেশনা দিতে সরকার দু'টি

টাস্কফোর্স গঠন করে। এ বিলের মাধ্যমে পোশাক শিল্পের জন্য বড় ধরনের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং স্কলাস্টিকা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মূর্শেদ দুই বছরের চুক্তিতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান।
- দেশের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ঋণ গ্রহীতার কাছে পাওনা ঋণের স্থিতি থেকে ৬০০ কোটি টাকা মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয়।

নভেম্বর ২৭

- সাম্প্রতিক বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সম্ভাব্য খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল সহায়তা চায়।
- সর্বশেষ জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে (এইচআরডি) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ স্থান পায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনে মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটবে।
- বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত মানুষদের কল্যাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রদানের আশ্বাস দেয়।
- রাজস্ব আদায় জোরদার করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নতুন উদ্যোগ হিসেবে কয়েক লাখ লোকের মোবাইল ফোনে এসএমএস বার্তার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।
- আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে নেদারল্যান্ড তিন বছর মেয়াদে প্রায় ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়।

নভেম্বর ২৮

- সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিডরে দেশের পশুসম্পদ খাতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মতে– সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৪টি জেলায় ১ লাখের ওপরে গরুবাছুর এব ং ২১ লাখ ৫০ হাজার মুরগি মারা গেছে।
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ৭ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ লাখ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।

নভেম্বর ২৯

- বন কর্মকর্তাদের এক প্রাথমিক হিসেবে দেখা যায়, সুন্দরবনের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় সিডরের ভয়ংকর আঘাতে ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার বন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবিউএফপি) এক সপ্তাহের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় সিডরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ৯টি জেলার ২২ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত লোককে ছয় মাসের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
- ঘূর্ণিঝড় সিডরে আঘাতপ্রাপ্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৩০ হাজার সন্তান সম্ভবা মহিলাকে সহায়তার সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)।
- ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসসহ লস এঞ্জেলস এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস সম্মিলিতভাবে সাড়ে ৩ কোটি টাকার ত্রাণ সাহায্য সংগ্রহ করে।

নভেম্বর ৩০

- ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এক দিনের সফরে ঢাকা পৌঁছান।

ডিসেম্বর ০১
- খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় সহায়তা করতে ৫ লাখ টন চাল রপ্তানির প্রয়োজনে ভারত বাংলাদেশের ওপর থেকে চাল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ভারত একই সঙ্গে সিডরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি গ্রামকে পরিপূর্ণ পুনর্বাসন করার প্রস্তাব দেয়।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা চূড়ান্ত হিসাবে দেখানো হয় যে, ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে দেশব্যাপী প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ৮ লাখ মেট্রিক টন আমন শস্যের ক্ষতি হয়েছে।

ডিসেম্বর ০৩
- প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে ঝুঁকি কমাতে সরকারের পদক্ষেপের জন্য আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর কাছে ১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা কামনা করেন।

ডিসেম্বর ০৪
- ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার (ডবিউএইচসি) নিজস্ব জরুরি তহবিল থেকে সুন্দরবনের জন্য সহায়তা নিতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানোর অনুরোধ জানায়।

ডিসেম্বর ০৫
- দি গোবাল ফ্যাসিলিটি ফর ডিজাসটার রিকভারি এন্ড রিকন্সট্রাকশন (জিএফডিআরআর), ডেনমার্ক এর অংশীদারগণ এবং বিশ্বব্যাংক ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়।
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কৃষির প্রয়োজনীয় উপাদান সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মেটাতে কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১ লাখ টন সার সংগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

ডিসেম্বর ০৬
- সরকার সাংবাদিক, সংবাদপত্রের কর্মচারি ও প্রেস শ্রমিকদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান সম্পর্কিত ৬ষ্ঠ ওয়েজ বোর্ডের চূড়ান্ত সুপারিশমালা অনুমোদন করে।
- মার্কিন সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দুই সপ্তাহের জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম শেষ করে।

ডিসেম্বর ০৭
- সার্কের ৮টি সদস্য দেশ অপরাধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার জন্য একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি পারস্পরিক আইনী সহায়তা চুক্তি (এমএলএটি) চূড়ান্ত করে।
- এডিবি কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে দু'টি দেশকে ৪৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ডিসেম্বর ০৮
- সার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের আঞ্চলিক উন্নয়ন তহবিলের কার্যক্রম শুরু করেন এবং অপরাধের বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করেন। এছাড়া তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, দিলীতে ২৯তম সার্ক মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক শেষে পরবর্তী বছরে শ্রীলংকা ১৫তম সার্ক সম্মেলনের আয়োজন করবে।
- ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্তদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতীয় নৌ বাহিনীর একটি নেভি জাহাজ পৌঁছে।
- ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্ত বাগেরহাট এবং বরগুনা জেলায় গৃহ নির্মাণে সরকার ৬০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয় ।
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের একদিন আগে উপদেষ্টা পরিষদ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭' অনুমোদন করে।

ডিসেম্বর ১০
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ৪৩ হাজার টন বাসমতি ব্যতীত অন্যান্য চাল ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়।

ডিসেম্বর ১১
- নিউ হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আরও দুটি প্রকল্পে জাপান ৩২৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
- জরুরি ভিত্তিতে চাল আমদানির জন্য সরকারি ক্রয় নীতিমালার (পিপিআর) কিছু শর্ত শিথিলের সিদ্ধান্ত নেয় অর্থনৈতিক সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি।
- মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সঙ্গে এক বৈঠকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত এলাকায় তাদের গ্রাহকদের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নিজ নিজ বিবেচনায় নূন্যতম ৩ মাসের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের বকেয়া আসল ও সুদ আদায় স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- রূপালী ব্যাংক হস্তান্তর করতে দরপত্রের নিয়মানুসারে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ৪৫৮ মিলিয়ন ডলার জমা দিতে সৌদি প্রিন্সের কাছে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন লিগ্যাল নোটিশ পাঠায়।

ডিসেম্বর ১২
- কারখানা মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে তৈরি পোশাক শিল্পের নেত্রীবৃন্দ ঈদউল আযহার আ গে তৈরি পোশাক শিল্পে যাতে কোন ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টি না হতে পারে, তার জন্য ১৯ ডিসেম্বরের আগেই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।
- দক্ষিণ এশিয়া টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক পরিষদের (এসএটিআরসি) সদস্যরা বাংলাদেশকে আগামী এক বছর সময়ের জন্য পরিষদের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে।

ডিসেম্বর ১৩
- বিশ্বব্যাংকের সহায়তার কৌশল নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল-সি প্যাটেল।
- বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে ৩৩.৬ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ৩৩৬ কোটি টাকা) অনুদান দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- জরুরি ঘূর্ণিঝড় সহায়তা এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অতিরিক্ত ৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় সুইজারল্যান্ড। অন্যদিকে সিডর আক্রান্তদের জীবন রক্ষায় দক্ষিণ কোরিয়া ৩ লাখ ডলার অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ডিসেম্বর ১৫
- দেশের উত্তরাঞ্চলে যেখানে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ মজুদ রয়েছে সেসব জায়গায় সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়।

ডিসেম্বর ১৭
- ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ৭৪ হাজার টন চাল এবং ৩৩ হাজার টন গম কেনার অনুমোদন দেয়।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে জিএসপি সার্টিফিকেটের অপব্যবহার রোধে সরকার রপ্তানিকারকদের জন্য দেওয়া জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া কঠোর করে।

ডিসেম্বর ১৮
- খাদ্য সঙ্কটগ্রস্ত এবং বৈদেশিক সাহায্য দাবিদার এমন ৩৭টি দেশের তালিকার মধ্যে জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত আরও চারটি দেশকে চিহ্নিত করে।

ডিসেম্বর ১৯
- বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ২০০ মিলিয়ন ডলারের ওপরে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত স্বরাষ্ট্র সচিব ডগলাস আলেকজান্ডার। এর মধ্যে ৬০ মিলিয়ন ডলার বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ওপর প্রভাব মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে।
- বেতন, ঈদ বোনাস, ওভারটাইম বিলের দাবিসহ কম বেতন দেওয়ার অভিযোগে গাজীপুরস্থ দীঘিরচলা এলাকায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। এএমসি সোয়েটার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য পাওনা না দিয়ে কারখানা তালা মেরে চলে গেলে প্রায় ৬০০ শ্রমিক সেখানে ভাংচুর শুরু করে।

ডিসেম্বর ২৫
- মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসের বাইরে ২শ'রও বেশি বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক আশ্রয় কামনা করে। তারা অভিযোগ করে যে, চাকুরিদাতারা তাদেরকে কম বেতন দিচ্ছে এবং তাদেরকে অত্যাচারও করছে।

ডিসেম্বর ২৬
- রূপালী ব্যাংক ক্রয় করার জন্য পুরো অর্থ জমা করতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নোটিশের জবাব দিতে সৌদি প্রিন্স বন্দর বিন মোহাম্মদ ব্যর্থ হন।

ডিসেম্বর ২৭
- বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী স্কলার, পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারীদের একত্রিত করতে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনাবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) সম্মেলন শুরু হয়।
- ভারত বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের চাল প্রতি টনের রপ্তানির মূল্য ৪২৫ ডলার থেকে ৫০০ ডলারে উন্নীত করে। (২০০৭ সালের আগে এলসি খোলা হলে প্রতি টন চালের মূল্য ৪২৫ ডলারেই নির্ধারণ করা হবে।)

ডিসেম্বর ২৯
- ভারত সেদেশে বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

ডিসেম্বর ৩১
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছাড়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) সরকারকে যমুনা সেতুর অর্থায়নের জন্য শেয়ার বাজারে ৫০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়ার প্রস্তাব দেয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতি বছরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পর্যালোচনা প্রণয়ন করে আসছে। এ পর্যালোচনাগুলি যাতে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী হয় সে ব্যাপারে সিপিডি সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছে। এসব গবেষণায় সিপিডি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সিপিডির নিজস্ব পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮ শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকসমূহের গতি-প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে আশাব্যঞ্জক দিক ও উদ্বেগজনক দিকগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ছয় মাসের জন্য সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সেগুলো মোকাবেলার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি পরামর্শও এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। এখানে বাজেটের উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনাসমূহকে গুরুত্বের সাথে নিরীক্ষণ এবং বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সিপিডি প্রস্তাবিত সুপারিশমালা। মাঠপর্যায়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও কৃষকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা ও সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির সুপারিশ করা হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে।

তাছাড়া বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংলাপের বিবরণী এবং ২০০৭ সালের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর একটি পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনাও এতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আশা করা যায়, বর্তমান গ্রন্থটি নীতিনির্ধারকদের গৃহীত কর্মসূচির মূল্যায়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক অবস্থা, বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির অভিঘাত, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন নাগরিকদের কৌতুহল ও আগ্রহ পূরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ী ৪০/সি, রোড ১১, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন (৮৮০ ২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪
ফ্যাক্স (৮৮০ ২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল cpd@bdonline.com
ওয়েবসাইট www.cpd-bangladesh.org www.cpd.org.bd

ISBN 984-300-001713-2
9 843000 017132